Bengalis In Chicago

presents

PORIJAYI/পরিযায়ী

Durgotstav – 2021

From The BIC family

From the Editor’s desk

সুদূর প্রবাসের থোরবড়িখাড়া জীবনেও মাঝে মাঝে উঁকি মারে শরৎকালের মিঠে রোদ্দুর। ল্যাবের কম্পিউটার স্ক্রিনের একঘেয়ে অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হটাৎ একদিন ভেসে আসে কাশফুলের গন্ধ। উদাসী মন ঠিক বুঝতে পারে --- মা আসছেন।

এবারের দুর্গাপুজো আমাদের জন্য খুব special। করোনার ভয়াবহতার স্মৃতি এখনো সবার মনেই টাটকা। করোনাসুর বধ করে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরুক জীবন --- এ আকুতি সকলেরই। তা থেকেই দীর্ঘ দুবছর বাদে এ বছর সশরীরে আমাদের BIC পরিবারের আবার দেবীর আরাধনা।

শিকাগোর ছাত্রছাত্রীদের ঐকান্তিক উদ্যোগে আয়োজিত এই দুর্গোৎসব। বিদেশের মধ্যে যেন বাংলার একটুকরো আস্বাদ। দুর্গাপুজো ছাড়া এই মনখারাপি মন কিকরেই বা ভালো হবে?

নতুন আর পুরাতনের মেলবন্ধন এই দুর্গোৎসব। যে ছাত্রছাত্রীরা গ্র্যাজুয়েট করে শিকাগো ছেড়ে চলে গেছেন, তারাও ঠিক থেকে গেছেন আমাদের সঙ্গে, কোনও না কোনও ভাবে। সবাই মিলে আমরা ভাগ করে নি আমাদের যাবতীয় হাসিকান্না।

আমাদের এই ছোট্ট প্রচেষ্টায় আপনাদের সকলের এত বিপুল সাড়া পেয়ে আমরা আপ্লুত ও আনন্দিত। সেই আনন্দ আপনাদের সকলের সাথে ভাগ করে নিতে প্রতিবারের মত এবারও নিয়ে এসেছি আমাদের পুজোর ম্যাগাজিন "পরিযায়ী।"

আপনাদের সবাইকে আমাদের তরফ থেকে শুভ শারদীয়া।

করোনার প্রকোপে হয়তো আমরা কেউই ভালো নেই, কিন্তু তাও শারদীয়ার এই শুভ তিথিতে দুর্গতিনাশিনীর কাছে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা সবাইকে যেন তিনি সুস্থ রাখেন।

ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। আর "পরিযায়ী" কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন।

সৌমিক ঘোষ (Editor)
দেবজা গাঙ্গুলী (Cover)
দেবজ্যোতি সাহা (Co-Editor)

Chirantan Chakraborty

ফিরব বললে ফেরা যায় নাকি?

প্রত্যয় মুখার্জি

শহরে সেদিন বৃষ্টি হয়েছে। ভরা বর্ষা। অনেক জায়গাতে জলও জমেছে। বাড়ি ফিরছিল হীরক। জমা জলে হাঁটা এখনো বেশ ভালোই লাগে। নামলেই যেন অভিযাত্রী। তখনি প্রতীকের কথা মনে পড়ে। প্রতীক জমা জল একদম সহ্য করতে পারত না। তবে গাঁজা খেলে আলাদা কথা। তখন তারা utopia-র মানুষ। সবাই সুন্দর প্রভু। ক্ষমা করে দাও সব্বাইই কে । হীরকের বিস্ময় একটাই "শালা ধোঁয়া খেয়ে কি মস্তি মাইরি"। যদিও প্রতীক বানাতে গেলেই ছড়াত। ওর অদ্ভুত sense of humor এর জন্য ওকে ওই ব্যাপার টায় ছাড় দেওয়া হয়েছিল। হীরক বানাত। তার বদলে প্রতীককে ক্রমাগত হ্যাজাতে হবে। quality হ্যাজ হাওয়া চাই।

ভাবতে ভাবতে বাড়ি এসে গেল। ভরা বর্ষায় হাল্কা একটা কনকনে ভাব। সন্ধ্যে নামছে শহরে। হীরক বাড়ি ঢুকল। মা অবিকল মুখ নিয়ে দরজা খুলল। জড় বস্তুর সাথে মায়ের তফাত একটাই। এখনো মাঝে মাঝে আফসোস করে।

তখন California-এ ভোর হচ্ছে। প্রায় এক বোতল glenfiddich শেষ। সব সফল সংসারী মানুষরা রাত ১১ টায় বাড়ি ফিরে গেছে। ঝকঝকে গাড়িটা নিচে দেখা যাচ্ছে। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে কি? রাতের অতিথিদের মুখ গুলো মনে করতে ছাইল, কিন্তু আর আলাদা করতে পারছে না প্রতীক। সবই যেন একরকম। একটাই মুখ, অনেক শরীর। সব মুখগুলো কি একটু বদলে গেল? চেনা চেনা লাগছে? হীরক বার বার বলত, "আর তো ২ বছর?" এখনো কি তাই বলছে? প্রতীকের মাথা ঘুরছে।

duplex এর ওপরের তলায় বউ ঘুমচ্ছে, মেয়ে, ছেলে অন্য ঘরে। ডাকবে কি ? নাহ, দেখি কি করে মালটা। কিচ্ছু বলছে না হীরক। একটা গান শুনতে পাচ্ছে প্রতীক। হাল্কা একটা বিষণ্ন সুর। চিনতে পারছে। একটু একটু চিনতে পারছে। কে চালাল এই গান টা? প্রতীক তো computer থেকে অনেক দুরে কারপেটের ওপরে। শুয়ে পড়ল প্রতীক কারপেটের ওপরেই, ভয়ে, নেশায়। তখন, প্রতীকের ঘর থেকে golden gate bridge এ শনিবারের প্রথম আলো পড়েছে। প্রতীক খালি একটা লাইন ই শুনতে পাচ্ছে বারবার: “ফিরব বললে ফেরা যায় না কি, পেরিয়েছ দেশ কাল জান না কি এ সময় …”

বিশ্রাম

সপ্তর্ষি মণ্ডল

দূরের রেল-শহরে ট্রেন চলেছে হুইসেল দিয়ে।

হেমন্তের রাত্রে একদুটি শ্বাপদ বেশ করে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে করছে খান্‌খান্‌।

আর এক হাওয়ারুদ্ধ চার-দেওয়ালে আমার নিশ্চিত নিশ্বাসকে সঙ্গী মেনেছে দেওয়ালঘড়িটি - টিক্‌, টিক্‌, টিক্‌!

এরকম বিজন নগরীতে দেখা হয়ে যায় আকাশপরিদের সাথে। অন্ধকারে তাঁদের শরীর ধরা পড়ে না, কিন্তু আঁচলে ছুঁয়ে যায় আমার আঙুল।

আর ফিসফিস করে কেউ কানের লতির পাশে যেন তার উপস্থিতি প্রমাণ করে --- তা খুব আসতে করে চালানো ফ্যানের হাওয়ায় ক্যালেন্ডারের খসখসানি কিনা বুঝতে বুঝতে কখন পৌঁছে যাই অন্য একটা দ্বীপে।

সে দ্বীপে গাছগাছালির বাস।

ভেজা পায়ের সারি দেখা যায়। মরা পাতা মুচড়ে আমি ভ্রমরের মতো এগিয়ে চলি তার কেন্দ্রের দিকে। মধ্যিখানে একটু বাগান করার সুন্দর জায়গা পেয়ে যাই। স্থলপদ্মের পায় কেও একজন রোজ ঝর্ণার জল দিয়ে যায়। ফুলের পাপড়ি কুড়িয়ে বাগানের পরে পড়ে এক সৌম্যকুটির।

সে কুটিরের প্রবেশপথে আমার পায়ে-পায়ে খেলে কাঠবেড়ালি। মাথায় লেগে থাকে খড়। বাসার মধ্যে এক মেয়েলি গন্ধ আসে বুকে। এক শ্যামলা মেয়ে আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকে। "এত দেরি কেউ করে বুঝি?" এই বলে সে ঝর্ণার জল গড়িয়ে দেয় পিতলের কলসি থেকে।

সেই মিষ্টি জল খেতে খেতে আমি তাকে দেখি। কিছু কথা হয়না। শুধু দেখি। সে বলে, "এস, এইখানে পিঁড়ি পেতে রেখেছি কতক্ষণ!"

তারপর সে আমার প্রিয় খাবারের নাম করে আর আক্ষেপ করে সব শুকিয়ে গিয়েছে বলে এই হেমন্তের রাতে। আমি বসে বসে চোখ রাখি কুটিরের মাটিতে লেপা দেওয়ালে। আর হারিকেনের আলোয় সে দেওয়ালে আঁকা আমার ছেলেবেলা একবার জ্বলে ওঠে, একবার নিভে যায়। আমি কাছে যাইনা।

কোথাও আমি রাম লক্ষ্মণ সেজেছি, কোথাও মহাদেবের মৌনতা। আর্দ্র মনে আমি সেই মেয়ের হাত ধরি। কপালে চুম্বন করি। তারপর সে তার মেটে-রঙ

নিয়ে আসে। সমুদ্রের খনিজ থাকে তাতে, সে রঙ মুক্তার মতো সাদা, পান্নার মতো সবুজ... আমার সাড়া গায়ে সে রঙ মাখিয়ে দেয় আর আমি পাশাপাশি শুয়ে পড়ি। আড়ালে পশুপাখি চরে।

যুদ্ধশেষের সৈনিককে তারা আর বিরক্ত করেনা।

Chirantan Chakraborty

Coronavirus

Aritra Jana

With the new variants seeming endless,

It is a result of the fact that it can quickly adapt.

It is a raft ---

That has never sunk.

It has also turned the wave;

With the spike proteins changing,

And the new variants ranging,

With some being more severe,

As a result of being able to evade the previous known receptors.

By doing so, it has started the process of evolution.

And soon the world will have devolution.

There is the death of neurons,

As the symptoms act like pawns,

With the lungs being taken down,

With the overflow of dead cells,

The coronavirus dwells.

Soon, all that has been made is lost.

The cytokine storm is what is deadlier than the virus itself,

And it is triggered by the response to the virus,

As it fails to recognize the self,

It ends up doing more damage in the long run.

New Education

Aritra Jana

New education must be able to foster intellectuals,

As well as the new technocrats.

From the many and not from the few,

The new education is one that is based on the change in the mode of production.

Where the current cannot be relied on,

Rather, the new must be relied on.

With the development of the cultural changes,

As well as the new assertion of a national identity,

It can bring together many groups;

As it is the one that is based on the new cultural revolution,

And when this is further combined with other means of revolutionary progress,

From the culture to the national identity,

And to the vanguard as well as to the technical progress,

It is further combined with total modernization,

And new emancipation,

Which is able to create a new nation,

This is the nature of the new education system,

Where the goal is to provide critical thinkers,

Which, in turn, will eventually stamp out reactionary thought among the upper echelons of the society,

And get rid of pity,

And as the class struggle moves ahead,

The investment will end up paying off,

As it can create a new generation

Of the very intellectuals,

As well as remake the service sector,

This time, being filled mostly by the new generation,

That was created through new education,

With the service sector no longer having unnecessary professions that only exist because of profit,

And others are demonized because it will not bring profit.

The role is reversed,

With the intellectuals making up the new middle class,

As well as the new mass,

Which is born through the grass.

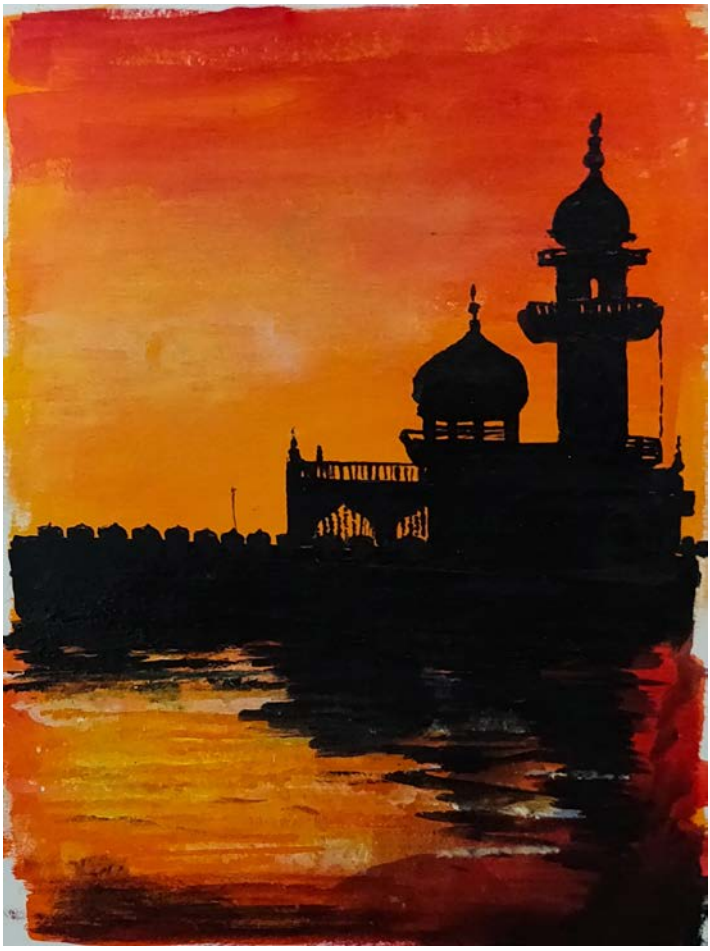

Bhagyashree Ghag

ড্রিম সিটি, রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

বর্তমানে ভায়ানক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণ সামাজিক জীবন কে অস্থির করে তুলেছে। মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোতে মানুষের অসচেতনতা, পরিবেশ ধ্বংস করে যাওয়া, ইচ্ছাকৃত ভাবে করা পরিবেশ দূষণ মানব জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। কোথাও মানুষ স্বপ্ন দেখে পরিবেশবান্ধব বসতির জন্য। আমার ছবির বিষয় এই স্বপ্নের শহর, যেটা অনেক মানুষ খুঁজে বেড়ায়।

shoi

FINEST SAREE
AND BLOUSE
COLLECTIONS FROM
DIFFERENT REGIONS,
CURATED WITH
UTMOST CARE,
JUST FOR YOU

SAREES

SCAN

we.are.shoi

shoi.sarees@gmail.com

Like our Facebook page to follow our Saree posts

রাজকন্যে

সৌমিক ঘোষ

ঐ আঁধারঘন রাতে
কোনও মায়াবিনী পথে
তার ঘোড়ার খুরে খুরে
সব কুয়াশা ভেদ করে
আগুনে পুড়ে পুড়ে
চলে হতভাগী চলে।

আমি তার শীতল হৃদয়তটে
কোনও দুখজাগানী রাতে
নাম লেখাই ক্ষণেক্ষণে
সব ঘরছাড়াদের সনে,
তার মনের গহন কোণে,
থাকি নীরবে নির্জনে।

তার ক্লান্ত রণসাজে
আর লালচে মেয়েলি লাজে
হিমেল শীতের রাতে
কোনও খেয়ালী হাওয়ার সাথে
সে শুধায় ধীরে ধীরে
এক ব্যর্থ হৃদয় চিরে;

"কেন ভালবাসিস মোরে?
কেন বাঁধিস মায়াডোরে?
কোনও যুদ্ধশেষের ভোরে

এক একাকী নগরতীরে
তোর অভাগা সেই ঘরে
আমি আসব আবার ফিরে।"

কোনও আলোয় রাঙা দিকে
সে মিলিয়ে যেতে যেতে
তার রক্তজবা ঠোঁটে
আঁকি চুমোর স্বরলিপি;
আঁধার চিরে চিরে
ঐ মাতাল সন্ধ্যাতীরে
তাকে ফিরে ফিরে ডাকি।

Leonard Cohen-এর "Joan of Arc" থেকে অনুপ্রাণিত।

Bhagyashree Ghag

বিপ্লবী

সৌমিক ঘোষ

রাজার সৈন্য ঘিরল চারিদিক
স্বর্ণপুরী করল ছারখার
জ্বালিয়ে দিল ঘর দোকানপাট
নগরীতে নামল আঁধার।

"সেলাম ঠোক্!" জানিয়ে দিল ওরা
"নইলে কাটব ধরে ধরে আনি!"
সমস্বরে গর্জে উঠি মোরা
"মানবো না তোদের শাসানি!"

ছাড়লাম ঘর, বাহির হলাম পথে
ছিনিয়ে নিতে মোদের মাতৃভূমি।
যুদ্ধে রক্ত ঝল্‌কে ঝল্‌কে ওঠে
শত্রুকে যে ভয় করিনা আমি।

ক্লান্ত রাতে শ্রান্ত নদীর ধারে
ঘুমের দেশে ঢলে পড়তে যাই
প্রিয়ের পোড়া মুখটা মনে পড়ে
আতঙ্কেতে ককিয়ে গুটিয়ে যাই।

কত বন্ধু মরল রাজার রোষে
কত বন্ধু লুটিয়ে পড়ল পথে;
কত বন্ধু কাটল জল্লাদে
নতুন বন্ধু আনে প্রতিশোধে।

পেয়াদারা সব জ্বালিয়ে দিয়েছে ক্ষেত,
জননী আমার মরেছে ক্ষুধার তরে,
রক্তবীজকে অতই সহজ মারা?
আমার জননী দিকে দিকে ঘরে ঘরে!

চার সখাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাই,
তিনজনেতে লুটায় গুলির লাগি;
চার সখাতে সূর্যস্নাত হই
করাল রাতে থাকি কেবল আমি।

আসবে আসবে আসবে সে এক দিন
সব অনাচার স্তব্ধ হবে যবে
মুক্তির ঐ মন্দিরের ধারে
তখন তুমি পাবে মোদের সবে।

Leonard Cohen-এর "The Partisan" থেকে অনুপ্রাণিত।

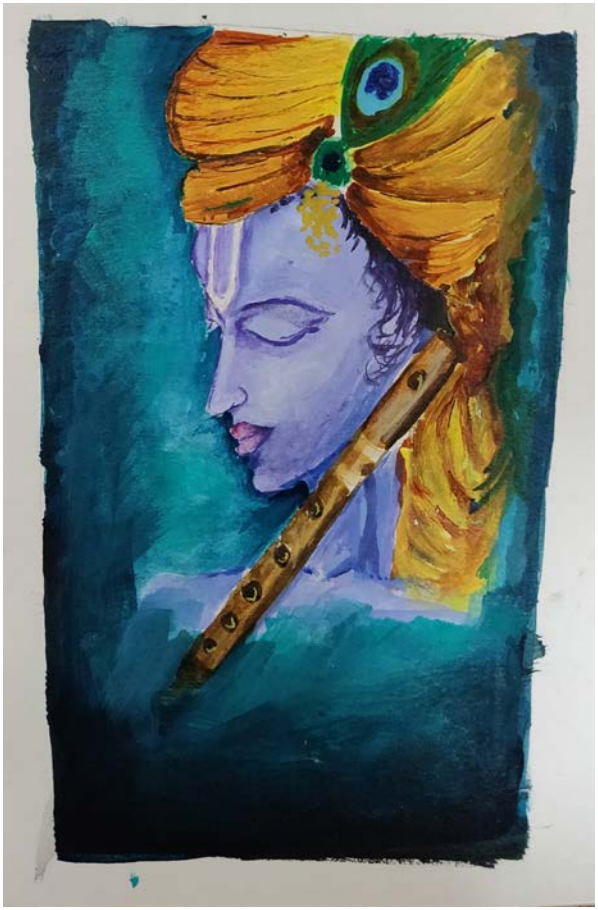

Bhagyashree Ghag

অর্থহীন

ম্যাগপাই

আঁধারে ডরাইনা মোরা
আলোতেই ভয়
সময়ে বাড়েনা বয়স
বাড়ে অসময়ে
কাঁসর -ঘন্টা ছেড়ে
রবিঠাকুরের গান
শব্দে-ছন্দে খোঁজো
পাথরে খুঁজোনা প্রাণ।

বৃহত্তরর তরে
বাড়িয়েছো হাত
হাতের চামড়া জানে
আসল তফাৎ
মেখেছ নতুন রং
নবীনের দাস
নতুন নয় - পুরনো
হওয়ার অভ্যাস।

সেই কবে ভালোবেসে
ভুলে আছো রোজ
একে একে দুজনেকি
হয়েছ নিখোঁজ ?
অর্থের খোঁজে কাটে
আরেকটা দিন

মুক্তির সন্ধানে
শেকলে-স্বাধীন।

আলো জেলে দেখেছ কি
কটা সাদা চুল?
দাঁতের গর্তে জমা
ক্ষমা - ক্ষোভ - ভুল?
কপালে উঠেছে ফুটে
কত বলিরেখা
দেখেছ চোখের কোলে
পরাজয় লেখা?

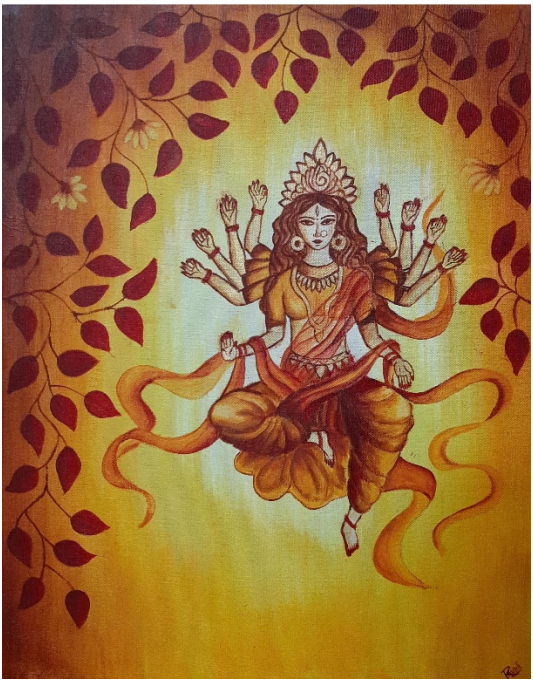

Debatri Nandi

Give yourself permission

Sree Sen

to hyper-ventilate

question the meaning of life

chew on your nails

fight with your beloved

look up at the sky & wonder –

how the amygdala

can process emotions

welling up in your abdomen, an appendix ready to burst at a moment's notice

be kind to your lonely self, anxious self, deranged self, overeating, binge-drinking

binge-watching self, over-achieving self

do what you've been planning but haven't yet

grow plants, spray paint, bake desserts in a rusty oven argue with the mirror

make plans A, B, C, D & then E, or don't forgive yourself for wallowing

for sudden tears at the long-forgotten sudden anger
at years lost in a frenzy of doing more, being more

now give yourself permission on this gentle day,

a gentle wave of breeze whispering that spring
follows winter, year on year

বিশ্বাস

অভিষেক সাহা

ডাঃ বিশ্বাস বিশ্বাসের সাথে
চিকিৎসা করে যান সুনিপুণ হাতে।
বিশ বছরে ডাক্তারি করে
কত বিষ তিনি দিয়েছেন সেরে।
বিশ্বাসের বড়ো ছেলে
অবিশ্বাস করে,
গলার মাদুলি নাকি
দিয়েছিল ছুঁড়ে।
বিশ্বাসের নিঃশ্বাস
নেবার সময়, বিষ শাঁসের
বিশ শাস,বিশেষ কারণে
ফেলে আসে জঙ্গলে
সবার বারণে।
বিশ দিন, বিষ দিন
মরে যাবে সাপ,
না মেরেও হনুমান
পাবে অভিশাপ।
অনুমান করে যদি মনুমান যাও,
সবার গো চরে তুমি
বেশি ঘাস খাও।
চাষ করে বাস করো
বানাও আবাস,
নতুবা থাকবেনা কোনো বিশ্বাস।

Agomoni

Pooja Das

The earth smells the aura of jasmines,
That fragrance of her divine presence,
Autumnal wind that kisses her feet,
Whispered to us her descending steps,
From her beloved Kailash, to this earth,
Where her children dwell.

Eyes that hold the ocean of kindness within,
The mother who holds the universe in her arms,
From a distance, I heard the gentle breeze,
The sounds of Dhaks tuning into rhythms,
Clouds move slowly with their wings,
And breezes are cold with swings.

She paints her hands, full of hope,
The world is suffering from illness,
She is here to take away the darkness.
Even Mother Nature is welcoming her to come,
Let’s open the door of happiness, Maa Durga is coming to her home.

চোর ও চুরি

স্বর্ভানু সান্যাল

নিশিকুটুম্ব কথাটা শুনেছেন নিশ্চয়? নিশিকুটুম্ব মানে রাতের অতিথি --- মানে সাদা বাংলায় চোর।

এই চোরেদের নিয়ে একটা চোরা আগ্রহ আমার আপনার সকলেরই আছে। চুরির নিদর্শন সহজেই পাওয়া যায় কিন্তু চোরেদের দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। কারণ চোরেরা অনেকটা ভূতেদের মত রাতের দিকে বাড়ি আসে। কিন্তু ভুত ও চোরের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ভূতেদের মানুষের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে কোনো আগ্রহ নেই। মানুষকে ভুতপূর্ব করে দিতেই ভুতেদের আগ্রহ। অন্যদিকে মানুষের সকল স্থাবর সম্পত্তিকে অস্থাবর করে দিতেই মানে সাদা বাংলায় নিয়ে কেটে পড়াতেই চোরেদের বেশি আগ্রহ। গৃহস্থের ওপর উৎপাত করে তার প্রাণনাশ করাই ভূতেদের উদ্দেশ্য আর গৃহস্থ যখন চিৎপাত হয়ে ঘুমোচ্ছে তখন তার ধননাশ করা চোরেদের উদ্দেশ্য ও বিধেয়। ভুতেরা ঘাড় মটকায়, অন্যদিকে চোরেরা ঘাড় ভাঙে।

চোরেদের একটা সৎগুণ হল তারা গৃহস্বামী বা স্বামিনীর ঘুমে মোটেই ব্যাঘাত ঘটায় না। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটাখাটনির পরে যে একটু শান্তির ঘুম লাগে সেটা সহৃদয় চোরেরা বোঝে বলেই তারা গৃহস্থের দরজা ভাঙে নিঃশব্দে। ঘুমের মধ্যেই যখন আপনি আপনার সুন্দরী প্রতিবেশিনীর সঙ্গে ঐ যাকে বলে একটু সদালাপ করছেন আর ভাবছেন "স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা, জাগিও না আমায় জাগিও না", সেই ফাঁকে হালকা করে চোরেরা আপনাকে এমন হালকা করে দেবে আপনি জাগবেনও না, জানতেও পারবেন না। চোরেদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল সিঁধেল চোর। তাঁরা একটা সিঁধ কাঠি নিয়ে ঘোরে।

যাদুকাঠির মতই সিঁধকাঠির ম্যাজিকে সব গোপন দরজা খুলে যায়। সেই পথেই চোরেদের প্রবেশ আর আপনার গৃহাভ্যন্তরস্থ জিনিসপত্রের নিষ্ক্রমণ। উৎকৃষ্ট মানের সিঁধকাঠি পাওয়া ছিল ভারি শক্ত। বংশানুক্রমে চোর ছেলে চোর বাবার থেকে প্রাপ্ত হত। যাকে বলে একেবারে উত্তরাধিকার। সিঁধ কাঠির জোড়ে সিঁধেল চোরেরা গায়ে তেল মেখে রাতের বেলা গোপন কম্মটি সেরে দিনের বেলা গোঁফে তেল দিয়ে ঘুমতো। চোরগিন্নি আর চোরের মা তখন "চোরের মায়ের বড় গলা" প্রমাণ করতে চুরির মালের ভাগ বাঁটোয়ারা করত।

কিন্তু এই জাতীয় চোর বিলুপ্তপ্রায় হল সিঙ্গল ফ্যামিলী হোম ছেড়ে ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরী হওয়ার পর। কারণ সিঁধ কেটে সুরঙ্গপথেই এঁদের অভিসার। কিন্তু তাতে নিচের তলার ফ্ল্যাটের বেশি এগুনো যায় না। এর পরে চোর ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে ইন্টারেষ্টিং হল পকেটমার। তাদের অফিসঘর শুনশান বাড়ি নয়, বরং বাস ট্রাম ষ্টেশানের মাঝেই তারা আড়ি পেতে থাকে। রাত্রিব্যাপারী নয়, দিনের বেলাতেই তাদের যত কারবারি। বাসের মধ্যে ভীড়ে চিড়েচ্যাপ্টা হচ্ছেন, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন না লোকের পায়ে ঠাহর করতে পারছেন না, এরকম ঘোরতর সময়েই তাদের নিপুণ শিল্পতে আপনি অল্প হয়ে যাবেন ঠাহর করতেই পারবেন না। এঁদের একটা সদগুণ হল আপনার পকেটের মালকড়ি ছাড়া আপনার ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে এনারা কানাকড়িও মাথা গলাবেন না। মানিব্যাগ হলে মানিব্যাগ, মোবাইল হলে মোবাইল যা আপনি মন খুলে স্বেচ্ছায় জনস্বার্থে দিতে চান সেটাকে পকেটস্থ করলেই হল, পকেটমার মহাশয় আপনাকে এতটুকু অপদস্থ হতে না দিয়ে ঠিক উঠিয়ে নেবে। তবে বাঘ সিংহের সাথে সাথে এই প্রজাতির চোরেরাও বিলুপ্তপ্রায়। কারণ হল বিকাশ বা প্রোগ্রেস।

বিকাশ এবং ধনতন্ত্রের মূল কথা হল আজ ধার, কাল নগদ। মানিব্যাগ গুলো হয়ে গেছে ঋণাধার। অর্থাৎ কিনা মানিব্যাগে কাশের বদলে থাকে হরা পিলা নীলা

হরেক রঙের রকমারি ক্রেডিট কার্ড। ক্যাশে যেমন সর্বজনসম্মতি, কার্ডে তেমন নয়। কারণ চোর খেটেখুটে আপনার কার্ড নেবে আর আপনি তৎক্ষণাৎ ব্লকিয়ে দেবেন কার্ডটাকে। পুরো শ্রমটাই জলে। আরও এক ধরণের চোর আছে যাদের নাম ছ্যাঁচোড়। চোরেদের সমাজে এরা নিতান্তই দলিত। বিভিন্ন রকমের ছ্যাঁচড়ামি করে বেড়ায় এদিক সেদিক। আমি এক ছ্যাঁচোড় বন্ধুকে জানতাম সে একটা সস্তা পুলিশ ড্রেস পড়ে ট্রেনে উঠে সবজিওলাদের কাছ থেকে তোলা সংগ্রহ করত। এখন তাকে পুলিশ (ওরিজিনাল) তুলে নিয়ে গেছে এবং সে শ্রীঘরে মহানন্দে দিন কাটাচ্ছে। আরও অন্য চোর আছে। চোরেদের সাথে চালাকি করতে পারে যারা তাদের বলে বাটপাড়। চোরাই মাল চুরি করে এরা চৌর্যবৃত্তিতে নিজেদের শৌর্য প্রদর্শন করে। চুরি যে লুকিয়েচুরিয়েই করতে হবে এমন মানে নেই। তাই আর এক ধরনের চোর আছে যারা দিন দাহারে বুক ফুলিয়ে চুরি করে। তাদের বলে রাজনৈতিক নেতা। আর সামান্য চক্ষুলজ্জার খাতিরে যারা টেবিলের তলা দিয়ে চুরি করে তাদের নাম সরকারি অফিসার।

আগেকার দিনে চোরেরা গায়ে তেল মেখে বেরত। কারণ চোরেদের সমাজে তেমন সুনাম নেই। শাস্ত্রে লেখা আছে "চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ো ধরা"। ধরা পরলে ধড়ে উত্তম মধ্যম পড়ে। তাই অন ডিউটি থাকাকালীন ধরা পড়া থেকে বাঁচতে তেল চুকচুকে খালি গা ভীষণ কাজে দিত। ছোটোনবেলায় একবার স্বচক্ষে ধরা পড়া চোর দেখেছিলাম। ল্যাম্পপোষ্টে বাঁধা। নিতান্তই খেতে না পাওয়া শীর্ণ চেহারা। চোর হিসেবে বিশেষ চৌকস নয় তার প্রমাণস্বরূপই বোধ হয়। গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা পথচলতি তাকে পিটিয়ে দিয়ে কর্তব্যসাধন করছে ও সুরুচির পরিচয় দিচ্ছে। সাপের মতই মানুষেরও একটা বিষথলি থাকে, আর মাঝে মাঝে সেই বিষ ঝাড়ার সুযোগ পেলে বিশেষ কৃতজ্ঞ বোধ করি আমরা। তাই ল্যাম্পপোষ্টে বাঁধা চোরটা বিশেষ জনকল্যাণ সাধন করছিল বলে আমার বিশ্বাস।

তবে সব চুরিতে যে পিটুনি জোটে তেমন নয়। যেমন মনচুরি। দ্বাপরযুগে গোপিনীদের monchuri করত এক রাখালবালক। কলিযুগে গোপিনীদের monchuri করে কিছু বাইকপালক। তারপর ধরুন বইচুরি। বই পড়ার জন্য চুরি করলে সেই চুরিকে আমরা ক্ষমা ঘেন্না করে নিই। কথাতেই আছে বই আর বৌ পরের ঘরে গেলে আর ফেরত আসে না। বউয়ের সামনে এবং বউ-এর সম্বন্ধে মুখ বন্ধ রাখাই ভাল। বই সম্বন্ধে এই সত্যতা আমি নিজেই পরখ করে দেখেছি। আমার বই যারা নিয়ে গেছে তারা আপন করে নিয়েছে। আমি নিজেই অনেকের বই নিয়ে এসে আত্মীয়তা স্থাপন করেছি। ফেরত দিই নি। ইন ফ্যাক্ট আমার নীতি হল আমার প্রত্যেকটা বই গায়েব হওয়ার সাথে সাথে আমি অন্যের দুটো করে বই গায়েব করব। এটাকে নীতি না বলে দুর্নীতি বলাই ভাল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চুরি আমি হামেশাই করে থাকি। যেমন মন্দিরে গেলে হামেশাই চটি জোড়া চুরি হয়ে যায়। আমি অবলীলায় অন্যের চটি পায়ে গলিয়ে বিগলিত প্রাণ হয়ে চলে আসি। এই ব্যাপারে একটা ছোট গল্প মনে পড়ছে। এক ভদ্রলোক মন্দিরের বাইরে ঘুরঘুর করছেন দেখে অন্য একজন তাকে জিগেস করলেন "কি খুজছেন?" ভদ্রলোক বললেন "এই চটিজোড়া খুঁজছি"। অন্যজন কালবিলম্ব না করে বললেন "আসার সময় পরে এসেছিলেন তো?" তাই নিজের চটি চটকে গেলে অন্যের চটি চুরিকে ঠিক জোচ্চুরির পর্যায়ে ফেলা হয় না। তবে চোর ও চুরি নিয়ে বলতে গেলে আর এক ধরণের চুরির কথা না বললে অন্যায় হবে। সেটা হল গান চুরি বা সুর চুরি। যারা একাজে পারদর্শী তাদের বলে প্রীতম। তবে চোরেদের জাতবিচারে এখন একেবারে কুলীন বামুন বলা যেতে পারে যাদের তারা হল ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার। এমনিতে হ্যাকিং করা মানে প্রোগ্রামিং করা হলেও বদ মতলবে হ্যাকিং করে এই কালো টুপি পরিহিতরা। বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই মধু ছড়িয়ে যোগাড় করে নেবে আপনার ডিজিটাল ব্যাঙ্কের চাবি। আর হাপিশ করে দেবে আপনার প্লাস্টিক মানি। হাপুস নয়নে কাঁদা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে

না আপনার। এই বিশাল প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হলে চোরেদের স্কিলসেট আপগ্রেড করে এই ডিজিটাল চুরিবিদ্যা শেখা উচিত। জীবিকা হিসেবে চৌর্যবিদ্যাকে ধরে রাখতে হলে হ্যাকিং শেখানোর জন্য সরকারী ভোকেশানাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট খোলা উচিত।

তবে চুরির কথা বলতে এসে সেই অসামান্য গানটার কথা না বললে অন্যায় হবে।
"ভিড় করে ইমারত আকাশটা ঢেকে দিয়ে চুরি করে নিয়ে যায় বিকেলের
সোনারোদ/ছোটো ছোটো শিশুদের শৈশব চুরি করে গ্রন্থকীটের দল বানায়
নির্বোধ/এরপর চুরি গেলে বাবুদের ব্রীফকেস অথবা গৃহিণীদের সোনার
নেকলেস/সকলে সমস্বরে একরাশ ঘৃণা ভরে চিৎকার করে বলে চোর চোর চোর
চোর চোর।"
কথাগুলো এমন নির্জলা সত্যি যে শুনলে আজও আমি কুর্নিশ করি সঙ্গীতকার, সুরকার ও গায়ক নচিকেতাকে।

তাই চুরি করুন। অবশ্যই চুরি করুন। আপনি শিশু হলে মাখন চুরি করুন, কিশোর হলে মন চুরি করুন আর জুড়ি খুঁজে পেয়ে গেলে বাকি জীবনটা করুন জোচ্চুরি।

One Frame at a Time

Suhail Dutta

The world around her seemed to pass by as if in a blur. Her eyes darted from one side to another hardly noticing the early morning rush for coffee and sustenance that the patrons of the café hoped would last them through the day. Oblivious to the countless eyes that stared at her perspiring face askance, her heart raced at a million miles a minute. People often have a difficulty in sorting out conflicts between conscience and rationale. In her case both told her not to do what she was about to. She had no conflict. She had no choice either. Her frying pan had caught fire.

She was over three hours late. Night had fallen.

"Miss Melanie. Right on time, as always."

"Thank you, George. I assume my brother is already here?" said Melanie Porter as she stepped onto the finely woven Persian carpet that laced every inch of her father's mansion.

"Yes, miss Melanie. You know Master Richard. He is an avid believer in being punctual", the sixty-seven-year-old butler replied. The hint of acerbity in his voice gave away his favorite among the siblings, as

did his look of disapproval at her discolored hoodie with obscene images on it, and jeans that seemed to have holes caused by filth rather than fashion.

"All right then." Melanie looked around, comparing her father's affluent living room to her filthy motel room which had almost become a permanent abode.

"Yes. Follow me, please." George led her through a countless number of rooms and passages. It was her first time there. She could swear she saw a few paintings that would fetch millions. As a shift leader on the security detail of the New York Art Museum, it was her job to know how valuable pieces of canvas with paint could be. That was before her drug problem kicked her out, of course.

"Miss Melanie, Sir. Should I leave now?" George said, showing her into the room occupied by her father and stepbrother.

"Yes, George. Go home for the night now. And take the weekend off. I need to have a few days alone with my kids." The old man spoke feebly from his bed.

"As you wish, Sir" George bowed and left.

Harold Porter looked at his daughter, scrutinized her from head to toe, and said, "There she is. I see you haven't changed much since I bailed you out. The silk scarf seems like a nice addition, though."

Melanie’s lips tightened. Her father could not resist making snide comments about her life choices. But then, which parent wouldn't? A compulsive gambler and a drug addict in rehab, Melanie had made some reckless decisions, including one where she almost drove over a policeman who had pulled her over for driving drunk. Her only sources of income were the drug rounds she made in her neighborhood, often stealing some for herself.

"My two favorite men in the world" Melanie countered her father's jibe with a one of her own. She looked at the handsome young man seated on the bedside and did a double take. True, she had never bothered to keep in touch, but in his expensive attire and his confident demeanor, she could hardly recognize the young boy she used to call her brother.

"Hello Melanie. It's been what? Fifteen, sixteen years?” Richard spoke. She couldn’t even recognize his voice.

“I wouldn’t know, Richard. When did you last convince your father to throw me out of the house?”

Melanie retorted, recalling the colossal sense of betrayal she had felt, all those years ago.

Richard smirked. Their father coughed and said. “Now, you two. I don’t want you to bring out your personal problems here. I have called you here for a very specific reason.” He tried to sit up, groaned a few times, then decided to give up, and continued from a prone position. “My health, as you are probably not aware of, is fading. I may not have much long to live. So, I need to decide how my assets must be taken care of, when I’m gone. All of the thirty-one million dollars.” Melanie’s eyes sparkled. She could do with the money. Unpaid debts and loans, in cash and kind, were breathing a financial fire down her neck. She HAD to convince her father to give her the bigger half.

She was drawn out of her thoughts by her father’s voice. He hadn’t stopped talking. “Now, Melanie, I am aware of your financial and... well, other troubles.” Her eyes shone further. “But...I think...” he started coughing violently and shaking, unable to complete his sentence. His last sentence.

Richard arose rapidly. “Dad?” Harold’s eyes were rolling, and he was foaming at his mouth. The shaking grew worse. Melanie drew closer, her eyes aghast with what they were witnessing. Her hands

were limp in shock, unable to help Richard in trying to delay the inevitable. Her father was dying.

And all she could think about was his money.

Melanie sat outside the fateful room and mulled things over in her head. She was amazed that she felt no grief at her father's demise. But her father's last words had thrown her hopes into turmoil. 'But...I think'. It meant that he wanted to divide everything up between her and that oaf whom she had to call her sibling. Melanie's brain did not like that at all.

She got up and peeked into the room. Richard was sitting on the chair. Sobbing softly to himself. Any sister, blood, or step would have offered a hug, at the very least. She had other ideas. Ideas that resonated in the eerie silence of the huge vacant mansion, inevitably ending in the numerous blunt and sharp objects lying around and the grief-stricken brother mourning in the next room. He seemed so helpless. So weak. So naive. He probably didn't even need the money, Melanie thought to herself.

She looked around, her eyes scanning the room for anything that she could use for her nefarious plan. Her eyes settled on a statue of a monk, with an unnaturally sharp edge. It seemed to have been meant to catch her eye. She picked it up and glanced back inside. Richard was staring at her, his eyes unbelieving of the fact that she was not mourning. It

did not faze her as she set the little statue back on its stand. For now, she thought to herself.

Because all she could think about was the money.

The night grew darker. Melanie stood in the darkness, softly pulling on a set of gloves. Not leaving fingerprints behind was something she had developed a skill for. Her fingers gripped the knife that her brother himself had used to cut up some fruits a few minutes ago. He had gone up to bed, still unable to gather himself together. She, of course, did not help. For a successful lawyer in Manhattan, he seemed to lack a spine, she thought.

She slipped out of her shoes and slowly climbed the stairs. She knew where her stepbrother was. She needed to ensure he was asleep. She was amazed that she felt no anxiety, no apprehension. She felt oddly calm as she crept up to the fateful room and moved inside, careful not to make any untoward sounds. The moonlight came through the open window and lit up his silent body on the bed as he lay, unaware of the world around him. She tiptoed closer to the bed till she was right next to him, lifted the knife and stabbed it into his flesh.

The moment her hands stabbed him, she felt a strange sensation coursing through her veins. She felt numb and unable to move. Her hands started

trembling and it was with an extreme intricacy that she pulled the weapon out. She stumbled out of the room and somehow managed to stagger into her own. She cleaned the blood from her hands and the stains from her trembling fingers. She felt tears roll down her cheeks. Unintentional involuntary tears. The gravity of the deed that she had performed hit her like a train.

All she could feel was guilt.

Morning came and she still felt unable to move from the position she'd been in for the previous four hours. Curled up in a ball on the floor. The tears still flowed; the guilt still hurt like the knife wound she had inflicted. It had all seemed so easy to steel herself before performing the heinous act. The plan had seemed perfect, the implications on her, a minimum. Now it seemed like she was stuck in a labyrinth from which she could not escape.

All she could think about was the moment when her hand deliberately drove the knife in. Finally, her practical side took over. She gathered herself and got dressed, careful to dispose of the gloves, but not the blood-stained knife. For her plan to work, the knife was essential. She wrapped her silk scarf around her neck and proceeded outside. The few people who were up and about at that early hour stared at her askance. Her disheveled hair and her

perpetually sweating face drew many unfriendly looks. She decided to calm herself down with some coffee. There, she told herself. That was a sensible decision. She sat in the cafe, sipping her coffee and staring out of the window. The blood-stained knife lay next to her handbag, covered with her blue silk scarf. Her mind wandered from one course of action to another. Her guilt told her to confess and turn herself in. Her mind told her that all she had to do was turn in the knife as evidence to the police and her case would be conclusive without doubt. This was the only way that she could stop her brother from getting a share of the money she needed. The only way she could...

Her phone chimed. She jumped at the sound, knocking off an elderly lady's coffee. It was a reminder of a text message from the previous day. She hadn't had a chance to even unlock her phone in the tumultuous past twelve hours. She opened it. Her bank statement read that her father had transferred thirty-one million dollars to her account.

Three blocks away, Richard Porter sat in a bar with a blood-stained little statue of a monk in one of his gloved hands.

শ্মশানকোকিলের ডাক

Magician

মার্কশিটটা হাতে নিয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পলাশ। আজ উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে এবং সে তিনটে সাবজেক্টে ফেল করেছে। যদিও পলাশ ফেল করার মতোই পরীক্ষা দিয়েছিল। তবু পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকে রেজাল্ট বেরনোর মাঝের এই দীর্ঘ সময় সে মনে মনে একটা কিছু মিরাকলের প্রার্থনা করছিল। পৃথিবীতে কত কিছুই তো ঘটে যার ব্যখ্যা পাওয়া যায় না। পলাশ খুব আশা করেছিল যে কোনও এক অলৌকিক উপায়ে সেও হয়তো পাশ করে যাবে। কিন্তু আর সবাই পাশ করলেও সে ফেল করেছে। তাও যেমন তেমন ফেল নয়, ভয়াবহ ফেল। বিমান সব ক'টা পরীক্ষায় পলাশের হাতে দেখে লিখেছিল। পলাশ বলেছিল, আমার দেখে লিখিস না, ফেল করবি।

বিমান শোনেনি। সেই বিমান পর্যন্ত দিব্যি থার্ড ডিভিশানে পাশ করে গেছে। বিমানদের পরিবারে এই প্রথম কেউ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করল। বিমানের জ্যাঠা তাই বিশাল এক কমলাভোগের হাঁড়ি নিয়ে স্কুলে ঢুকে পড়েছে। তার চারপাশে মাছির মতো ভিড় করেছে ছেলেরা। বিমানের জ্যাঠা চেঁচাচ্ছে, খাও বাবাসকল, খাও। পেট ভরে খাও। আরও দু হাঁড়ি মিষ্টি আসছে। এই হাঁড়ি শেষ করতে না করতেই চলে আসবে।

হাঁড়ি শেষ। সারা হাতে মুখে রস মেখে ছেলেরা পরের হাঁড়িগুলোর জন্য অপেক্ষা করছে। কে এক জন চুপি চুপি তার রসের হাত পলাশের জামায় মুছে দিয়ে চলে গেল। পলাশ বুঝতেও পারল না। সে মার্কশিটটা হাতে নিয়ে ভবিষ্যতের ভয়াবহ

দিনগুলোকে আঁচ করার চেষ্টা করছিল। আসলে কপালটাই খারাপ পলাশের, নইলে তার ভালোমানুষ মা কি অমন ভাবে আগুনে পুড়ে মরত? মা চলে যাওয়ার পর থেকেই পলাশের শনির দশা শুরু হয়েছে। হঠাতই মায়ের কথা মনে পড়ায় চোখে জল এল পলাশের। সবাই ভাবল, সে ফেল করেছে তাই কাঁদছে।

পাড়ার সবাই পলাশের মাকে দুগগাঠাকুর বলত। সত্যিই বড় সুন্দর দেখতে ছিল মাকে। একমাথা কোঁকড়ানো চুল। তুলি দিয়ে আঁকা টানা টানা চোখ। আর মায়ের সেই অদ্ভুত সুন্দর হাসি। মা কখনোই বকত না পলাশকে। তবে বাবা খুব মারত। বাবা অবশ্য মাকেও মারত প্রায়ই। খুব সুন্দর ছবি আকত মা, আর গান গেয়ে ঘুম পাড়াত পলাশকে। মায়ের কছেই তো পলাশ ছবি আঁকতে শিখেছিল। বড় ভাল ছিল মা। পলাশ বইতে পড়েছিল, ভাল মানুষেরা বেশি দিন পৃথিবীর এই ধুলো, ধোঁয়ার মধ্যে থাকতে পারে না। ঠিক তাই হল।

পলাশের তখন ক্লাস নাইন। এক দিন স্কুল থেকে ফিরে দেখল, বাড়ির সামনে খুব ভিড়। তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হল না। পাশের বাড়ির ময়নাপিসি তাকে নিয়ে গেল। সে শুনল, তার মা ইটভাটার চুল্লির মধ্যে পড়ে মারা গেছে। মাকে শেষ বারের মতো দেখার জন্য আছাড়িপিছাড়ি হয়ে কেঁদেছিল পলাশ। কিন্তু দেখতে পায়নি। সে স্কুল থেকে ফেরার আগেই মায়ের ঝলসানো দলা পাকানো দেহটকে সৎকার করে ফেলেছিল বাবা। বাবা না কি বলেছিল, ওর দেখার দরকার নেই। একে বাচ্চা মানুষ, তার ওপর মায়ের ন্যাওটা ছিল। মনে আঘাত পাবে।

আজও হিসেবটা ঠিক মতো মেলাতে পারে না পলাশ। বাবা ইটভাটার ম্যানেজার ছিল। তাদের বাড়ি থেকে ইটভাটা অনেকটা দূর। বাবা রোজ দুপুরে খেতে আসত।

যে দিন আসত না, সেদিন খাবার নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠাতো। সে দিন বাবা খেতে আসেনি। খাবার নিতে কোনও লোকও পাঠায়নি। মা তাই নিজেই বাবার খাবার নিয়ে ইটভাটায় গেছিল। বাবা কেন খেতে আসেনি সে দিন? অন্য কারুর হাত দিয়ে খাবার না পাঠিয়ে কেন নিজেই গেল মা? আর যদি বা গেল চুল্লিতে পড়লই বা কী ভাবে? এসব নানা উত্তরহীন প্রশ্ন আজও তার মাথায় ঘুরপাক খায়। তবে এই হিসেব মিলুক আর না মিলুক, পলাশের জীবনের অন্যসব হিসেব খিচুড়ি পাকিয়ে গেল মা মারা যাওয়ার পরেই। ময়নাপিসির মা বলেছিল, মা মরলে বাপ আর তালুইমশাইতে কোন তফাৎ থাকে না। কথাটা তখন বুঝতে পারেনি পলাশ। বুঝল মাস দু'য়েক পর যখন বাবা আর একটা বিয়ে করল। বিয়ের পর পরই বাবা তাকে জোর করে নতুন মায়ের বাপের বাড়িতে রেখে এল। সেটা অবশ্য খুব দূরে নয়, পাশের গ্রামেই। কিন্তু ওই বাড়ির লোকগুলো যেন কেমন। ওদের বাড়ির লাগোয়াই লেদ কারখানা ছিল। সারাদিন সেখান থেকে লোহা কাটার বিশ্রী শব্দ আসত। ওরা পলাশকে দিয়ে লোহা বওয়াতো আর ছুতোনাতায় খুব মারত। খেতেও দিত না ঠিক মত। স্কুলে যাওয়াও লাঠে উঠেছিল প্রায়। সব মিলিয়ে পলাশের তখন পাগল পাগল দশা। দিনরাত মায়ের কথা ভেবে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত। শেষে আর থাকতে না পেরে পালিয়ে চলে এসেছিল পলাশ। বাবা তাকে লাথি মেরে বের করে দিয়েছিল। চোখ লাল করে বলেছিল, নেমকহারাম কোথাকার। যারা খাওয়াচ্ছে, পড়াচ্ছে, ইস্কুলে পাঠাচ্ছে তাদের নামেই কুচ্ছো গাইছিস? মায়ের রক্ত যাবে কোথায়? চুপচাপ চলে যা। যদি কোনও বেচাল দেখি গলা কেটে রেখে আসব।

পলাশের খুব ইচ্ছে হয়েছিল পালিয়ে যায়, কিন্তু যেতে পারেনি। সাহস পায়নি মোটে। অবশ্যও আরও একটা কারণ ছিল। অন্তরাকে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবতে খুব কষ্ট হয়েছিল তার।

বছর খানেক পরে বাবা নিজেই একদিন পলাশকে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিল। আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় চোখে এসে গেছিল পলাশের। বাবার ওপর সব রাগ, অভিমান হাপিস হয়ে গেছিল। পলাশের সমস্যা হল, সে কারও ওপরেই খুব বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না। কেউ একটু ভাল করে কথা বললেই সে গলে যায়। কেউ তাকে ভালোবাসলে তার চোখে জল চলে আসে। অন্তরা তো বলে, পলাশদা তুই বড় ছিঁচকাঁদুনে। যা তো। পুরুষ মানুষ কোথায় একটু শক্তপোক্ত হবি তা না। পাগল কোথাকার।

পলাশ উত্তর দেয় না। হাসে। মা চলে যাওয়ার পর এই একটাই তো ভরসার জায়গা পড়ে আছে। পলাশদের কয়েকটা বাড়ি পরেই অন্তরাদের বাড়ি। পলাশের মা বেঁচে থাকতে খুব আসত অন্তরা। সন্ধ্যেবেলা মা, পলাশ আর অন্তরা উঠোনে মাদুর পেতে বসত। মাঝখানে রাখা থাকত একটা হ্যারিকেন। একটা দু'টো করে তারা ফুটত আকাশে। ঠান্ডা হাওয়ায় ভেসে আসত মাধবীলতার গন্ধ। গানের লড়াই খেলা হতো। মা গাইত, 'যাক, যা গেছে তা যাক...'

তার পর অন্তরাকে বলত, 'ক' দিয়ে গান ধর, এ বার তোর পালা।

অন্তরা গাইত, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু...'

গানের লড়াইতে যে পুরো গানটা গাইতে নেই, এটা ভুলে যেত অন্তরা। বিভোর হয়ে গাইত। মা আর পলাশও তার ভুল ধরিয়ে দিত না। পলাশের মনে হতো সারারাত ধরে গাইতে থাকুক অন্তরা।

নতুন মায়ের বাপের বাড়ি থেকে পালিয়ে মাঝে মাঝেই অন্তরার সঙ্গে দেখা করতে আসত পলাশ। জামা তুলে পলাশের পিঠ দেখে শিউড়ে উঠত অন্তরা, এ ভাবে মেরেছে? ওরা কি জানোয়ার? তুই আটকাসনি?

পলাশ বলত, ও বাবা! আটকাবো কী করে? ওদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারব না কি?

রেগে যেত অন্তরা। চিৎকার করত, তা বলে পড়ে পড়ে মার খাবি?

তো কী করব?

তুই উল্টে মারতে পারিস না?

ছি ছি। গুরুজন যে।

গুরুজন বলে মাথা কিনে নিয়েছে? তোর বাবাটা তো এক নম্বরের শয়তান, কিন্তু তুই এত ক্যাবলা কেন পলাশদা? তোকে আমার অসহ্য লাগে।

রেগেমেগে হন হন করে হেঁটে চলে যেত অন্তরা। কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে আসত। কোঁচড় থেকে কয়েকটা তিলের তক্তি বার করে হেসে ফেলত, পিসি বানিয়েছে। সারাক্ষণ মিলিটারির মতো পাহারা দিচ্ছে। তার মধ্যেই চুরি করে নিয়েছি। আয় দু'জনে খাই।

তিলের নাড়ু বা তক্তি পলাশ দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু অন্তরার দেওয়া তিলের তক্তি খেতে খেতে তার মনে হতো, মানুষের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার হচ্ছে তিলের তক্তি। এই খাবারকে এখনই জাতীয় খাদ্য করে দেওয়া উচিৎ। আর যারা এটা খেতে অস্বীকার করবে তাদের কোনও ক্ষমা নেই। সরাসরি কোর্টমার্শাল।

বাবার বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণটা অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছিল পলাশ। পলাশের ভাই-বোন হবে, তাই নতুন মায়ের বিশ্রাম দরকার। লোহা তুলে পলাশের গায়ে এখন বেশ জোর হয়েছে। সে দিব্যি ঘরের কিছু কাজ করতে পারবে।

পলাশের একটা ভাই হল। ছোট্ট মানুষটাকে দেখে আনন্দে কেঁদে ফেলল পলাশ। সে সারাদিন ভাইকে পাহারা দিত। কিন্তু নতুন মা একটু সুস্থ হতেই, তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল বাবা। আবার তার ভাই-বোন হবে। তাই মাস তিনেক আগে বাবা তাকে নিয়ে এসেছে। নতুন একটা কাজের লোক রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু সেও বুঝে গেছে, পলাশ চাকরেরও অধম। এ বাড়িতে কাক কুকুরের যতটুকু সম্মান আছে পলাশের তাও নেই। তাই সে তার নিজের কাজগুলো যথাসম্ভব পলাশকে দিয়ে করিয়ে নিতে চায়। মুখ বুজে সব কাজ করে পলাশ। বিদ্রোহ করার মতো সাহস নেই তার।

কোনও মতে টেনেটুনে মাধ্যমিকটা পাশ করে গিয়েছিল পলাশ। বুঝতেই পেরেছিল, উচ্চমাধ্যমিকটা আর হবে না। কিন্তু পাশ করাটা দরকার ছিল। সে ভেবে রেখেছিল, পাশ করলেই বাড়ি ছেড়ে পালাবে। শান্তিনিকেতন চলে গিয়ে ছবি আকার কলেজে ভর্তি হবে। বুদ্ধিটা দিয়েছিল অন্তরা। সেই আশাতেও ছাই পড়ল।

মার্কশিট হাতে বাড়ি ফিরতেই পলাশের পিঠে আস্ত একটা চ্যালাকাঠ ভাঙল পলাশের বাবা। তার পর দুই গালে জুতো মারতে মারতে বলল, কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা নষ্ট করে তোকে পড়িয়ে কী লাভ হল শুনি? আর পড়তে হবে না। কাল থেকে ইটভাটায় লেবারের কাজ করবি। তোর পেছনে এত খরচ করার এই প্রতিদান দিলি? মায়ের রক্ত যাবে কোথায়? নেমকহারাম কোথাকার।

পলাশের খুব ইচ্ছে করছিল, বাবার জিভটা ছিঁড়ে দেয়। তারপর সেটাকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয় খুব করে। কিন্তু সে কিছুই করতে পারল না। তার রক্তে সাহস বস্তুটার বড়ই অভাব। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার বলতে ইচ্ছে করছিল, পড়াশোনা বস্তুটা ছেলেখেলা নয়, তাকে সময় দিতে হয়। সময়টা সে আদৌ পেয়েছে কি? কিন্তু তীব্র অপমানবোধ আর ব্যর্থতায় তার মাথার ভেতরটা গুলিয়ে গেল। সে অনুভব করল, এই পৃথিবীতে তার প্রয়োজন বড়ই কম। পাশাপাশি আরও এক বছর নরকযন্ত্রনা ভোগ করার ভয় তাকে জাপটে ধরল আস্টেপৃষ্ঠে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো শ্মশানের দিকে হাঁটতে শুরু করল পলাশ।

দুই...

লোহার পোল পেরিয়ে খালের ধার বরাবর বাঁ দিকে বেশ কিছুটা হাঁটলে তবে শ্মশানের সীমানা শুরু। কয়েক বছর আগেও আশেপাশের সাত আটটা গ্রামের লোক এখানে মরা পোড়াতে আসত। বড় বড় কাঠের চুল্লি জ্বলত দাউ দাউ করে। ঘি আর চামড়া পোড়া গন্ধে ভারী হয়ে থাকত এখানকার বাতাস। দাহকাজ শেষ করে শ্মশানবন্ধুরা স্নান করতে নামত খালে। সুন্দর করে ঘাট বাঁধানো ছিল। ছিল শ্মশানবন্ধুদের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার ঘর। শ্মশানের বাইরেই ছিল কয়েকটা দোকান।

দাহকাজে লাগে এমন সব জিনিস বিক্রি হত সেখানে। সব মিলিয়ে বেশ একটা জমজমাট ব্যাপার। কিন্তু হঠাত শ্মশানে এক পাগলির আবির্ভাব হল। খালের ধারে এক মহানিম গাছের তলায় সে আস্তানা গাড়ল। মরা পোড়াবার সময় সে চুল্লির কাছে এসে বসত। চুল্লির দিকে তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে আর হি হি করে রক্তজল করা শব্দে হেসে উঠত। আগুন বাড়লেই সে দু' হাতে তালি দিয়ে নাচতে শুরু করত আর বলত, এ বার কলজেটা ধরছে, কলজে। টাটকা কলজে। কলজে পুড়ে তুকতুকে নরম হয়ে যাবে। বড় স্বাদ হবে। কে কে খাবি? আয় আয়।

সেই স্বাদের কথা ভেবেই কি না কে জানে সে পাগলির ফোকলা মুখের কষ বেয়ে লালা গড়াত আর তার ওই ডাক শুনে রাজ্যের কাক ভিড় করতো সেই খানে। তাদের 'খা খা' ডাকে তালা ধরে যেত কানে। চুল্লির অনেকটা ওপরে গোল হয়ে চক্কর কাটতো এক পাল শকুন। সে বড় ভয়ের দৃশ্য।

এক দিন পাগলির কী খেয়াল হল, চুল্লির মধ্যে থেকে আধপোড়া একটা হাত নিয়ে দৌড় লাগাল। লোকজন এমনিতেই পাগলির কান্ডে বিরক্ত ছিল তার ওপর এই ঘটনা তাদের একেবারে খেপিয়ে তুলল। কয়েক জন শ্মশানবন্ধু ছুটে গিয়ে তাকে কাছের একটা ঝোপের আড়াল থেকে টেনেহিঁচড়ে বার করলো। সে তখন দু'টো শকুনকে পরম যত্নে হাতটা খাওয়াচ্ছিল। নিজেও খাচ্ছিল একটু একটু করে। ওখানেই তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলল সবাই। এই ঘটনার পর থেকেই শ্মশানটায় শ্মশানকোকিল ডাকতে শুরু করল।

প্রথমটায় কেউ বুঝতে পারেনি। ঘোষপাড়ার ছেলেদের একটা দল ছিল। তারা সবার সঙ্গেই শ্মশানবন্ধু হত। তাদেরই এক জন হাবু, প্রথম শুনল শব্দটা। তখন বেশ

রাত হয়েছে। দাহকাজ শেষ করে ওরা খালের জলে স্নান করতে নেমেছে। হাবু বলল, বুড়োদের মতো গলায় কে কাশল রে?

ছেলেদের দলে বুড়ো আসবে কোত্থেকে? বাকিরা হাবুকে বলল, তুই ভুল শুনেছিস।

হাবু জোর গলায় বলল, না রে আমি ঠিক শুনেছি। বুড়োদের গলায় কফ জমলে যেমন ঘড় ঘড় করে শব্দ হয়। তেমন গলায় কেউ কাশল। ওই তো আবার কাশছে। স্পষ্ট শুনছি।

বাকিরা কেউ কিছু শুনতে পেল না। তারা ভাবল, হাবুর বোধ হয় নেশাটা একটু বেশিই ধরেছে। হাবুকে নিয়ে খুব আমোদ করল তারা। কিন্তু স্নান সেরে বাকিরা উঠে এলেও হাবু উঠল না। পরদিন দুপুরে তার দেহ ভেসে উঠল খালে।

হাবুর পর সনাতন বসাক। দীনেশপল্লীতে তিন দিন ধরে যাত্রা হবে। কলকাতা থেকে দল এসেছে। সিনেমার একজন নায়িকাও আছে সেই দলে। তাকে নিয়ে জোর গুজব রটেছে। কেউ বলছে, সে নাকি ঘোড়ায় চড়েই স্টেজে চলে আসে। আবার কেউ বলছে, ঘোড়ায় চড়াটা তেমন কোনও ব্যাপার না। সে না কি স্টেজের ওপরেই জামাটামা সব খুলে ফেলে। সে এক্কেবারে হইহই কান্ড। ঘোড়ায় চড়ার থেকে জামা খোলার গুজবটা লোকে খেয়েছে বেশি। মেয়েমানুষের জামাটামা খোলায় সনাতনের আবার খুব উৎসাহ। তার ওপর সেই মেয়েমানুষ যদি সিনেমার নায়িকা হয় তাহলে তো মাখোমাখো ব্যাপার। তাই কাজ শেষ করেই জোর সাইকেল ছুটিয়েছিল সনাতন। শ্মশানের ভেতর দিয়ে শর্টকাট হয়। হঠাত সে শুনল, শ্মশানের

ভেতর কোনও বুড়ো লোক খুব কাশছে। সে একেবারে মরণ কাশি। সনাতন সাইকেল থেকে নেমে খুঁজেপেতেও কাউকে দেখতে পেল না। তার গা ছমছম করে উঠল। বাড়ি ঢুকে উঠোনে হাত মুখ ধুতে ধুতে সে যখন তার বৌকে কাশির গল্পটা বলছে, আচমকা একটা কেউটে তার ডান পায়ের ডিমে ছুবলে দিল। হাসপাতালের পথেই মারা গেল সনাতন।

এর পর আরও কয়েক জন ওই কাশির শব্দ শুনল এবং তারাও নানা ভাবে মারা পড়ল। গ্রামের পুরোহিত মশাই বললেন, এ হল শ্মশানকোকিলের ডাক। ও ডাক যে শোনে সে আর ফেরে না। আমি শ্মশানকোকিলের কথা শুনেছিলুম অনেক আগে। শ্মশানকোকিল পাখি নয়, আসলে দুষ্ট আত্মা। পাখির ভেক ধরে থাকে। ভেবেছিলুম গল্পকথা। কিন্ত এখন দেখছি, নির্জলা সত্যি। একটা যখন এসেছে, টানে টানে আরও আসবে। শ্মশানকোকিলে ভরে যাবে জায়গাটা। বাঁচতে চাও তো কেউ ওই শ্মশানের ধার মাড়িও না। খুব সাবধান।

সেই থেকেই পরিত্যক্ত হয়ে গেল শ্মশানটা। এমনিতেই শ্মশান মশান নির্জন জায়গা। তার ওপর লোক চলাচল বন্ধ হতে পায়ে চলার পথটাও মুখে গেল। হাঁটু সমান বুনোঘাস আর চোরকাঁটা গজিয়েছে। বড় বড় জারুল, শিরিষ, কুল, বাবলা, তেতুল, আর মহানিম গাছগুলো জড়ামড়ি করে যেন আরও ঝুপসি করে তুলেছে জায়গাটাকে। দিনের বেলাতেই ভাল করে আলো ঢোকে না, সেখানে এখন তো প্রায় সন্ধে। কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

পলাশের পায়ের তলায় মট করে কী যেন একটা ভাঙল। পলাশ দেখল, একটা মেটে হাঁড়ি। এক সময় এখানে যে দাহকাজ হতো তার টুকরোটাকরা প্রমাণ ছড়িয়ে

ছিটিয়ে রয়েছে এখনও। ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে আছে প্রচুর কাঠকুটো। কাঠচোরেরাও এই শ্মশানের ত্রিসীমানায় আসে না। সবারই প্রাণের মায়া আছে। শুধু যারা ভালোবাসে তাদের ভয়ডর একটু কম। মাঝে মধ্যেই দু'-একটা জোড়া এ দিকে চলে আসে। নির্জনে বসে দু'টো ভালবাসার কথা বলার মতো জায়গার বড় অভাব এই পৃথিবীতে। তাই তাদের আসতেই হয়। তারা অবশ্য শ্মশানের ভেতরে ঢোকে না। কিছু দূরে খাল যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে বসে থাকে। আজও দু' জন বসেছিল। পলাশকে শ্মশানের ভেতর ঢুকতে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

একটা মহানিম গাছের গুঁড়িতে শরীরটা ছেড়ে দিল পলাশ। এখন শুধু অপেক্ষা কতক্ষণে সেই কাশির শব্দ শোনা যাবে। রাগ, দুঃখ অভিমান কিছুই হচ্ছে না পলাশের। শুধু মাথার ভেতরে এটা ভোঁতা যন্ত্রণা হচ্ছে। অন্য যে কোনও ভাবেই আত্মহত্যা করা যেত। কিন্ত মৃত্যুকে নিশ্চিত করতেই শ্মশানকোকিলের ডাকের অপেক্ষায় বসে রইল সে।

চার দিকটা অসম্ভব নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে ঝিঁঝি ডেকে উঠে সেই নিস্তব্ধতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। হঠাতই কীসের যেন একটা শব্দ হল। কান খাড়া করে শুনল পলাশ। না কাশির শব্দ তো এটা নয়। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কিছু একটা হেঁটে যাচ্ছে। বুকে হাঁটছে। তারই শব্দ হচ্ছে। খুব কাছেই শব্দটা হচ্ছে। সাপ-টাপ হবে। যে মানুষ মরতে এসেছে তার মৃত্যুভয় থাকে না। ফের চোখ বুজল পলাশ।

প্রথমেই একটা সাদা আলোয় পলাশের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তার পরেই কান ফাটানো আওয়াজে চমকে উঠলো সে। কাছেপিঠেই কোথাও বাজ পড়েছে। নাকে একটা পোড়া গন্ধ আসছে। অনেকক্ষণ বসে থাকায় সময়ের হিসেব গুলিয়ে গেছে।

ঠিক কতটা রাত হয়েছে বুঝতে পারল না পলাশ। আর তখনই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। একেবারে তুমুল বৃষ্টি যাকে বলে। গাছের শামিয়ানা ভেদ করে জল পড়তে লাগল। পুরো ভিজে গেল পলাশ। আর শুধু বৃষ্টি তো নয়, তার সঙ্গে বাতাসও বইছে। বাজ পড়ছে ঘন ঘন। দুর্যোগ বোধ হয় একেই বলে। তার একটু শীত করতে লাগল। হাঁটু দুটো বুকের কাছে জড়ো করে বসতেই হাঁটুর নীচে একটা খোঁচা খেল সে। বুক পকেটে হাত দিয়ে বস্তুটা বার করে আনতেই পলাশের মনে পড়ে গেল, সে না ফিরলে অন্তরা রেওয়াজ করতে পারবে না।

পকেটে ছিল একটা হারমোনিয়মের চাবি। অন্তরার হারমোনিয়ামটা কয়েক দিন ধরে গোলমাল করছিল। অন্তরা বলেছিল, এই চাবিটা একটু বিজন সামন্তের দোকান থেকে সারিয়ে এনে দিবি পলাশদা?

পরশু দিনই চাবিটা সারিয়ে রেখে দিয়েছিল পলাশ। দিতে ভুলে গেছিল। ভেবেছিল, আজ গিয়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু মার্কশিট পাওয়ার পর ঘটনা পরম্পরায় ভুলে গেছিল। পলাশ ভাবল, অন্তরা তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। জিনিসটা গিয়ে দিয়ে আসা উচিৎ। কিন্তু তার পরেই সে ফের হেলান দিল গাছের গায়ে। তার মতো একটা হতভাগার জন্য অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। সে মরে গেলে অন্তরা কষ্ট পাবে। সে কত কিছুতেই তো মানুষ কষ্ট পায়। অত ভাবলে আর মরা যায় না। তবে দিন কয়েক আগে অন্তরা কী যেন একটা জরুরী কথা বলবে বলেছিল। মরে গেলে সেটা আর শোনা হবে না। এটাই যা আফশোস।

অন্তরার ঘরে নতুন রঙ হয়েছে। অন্তরা আবদার করেছিল, আমার ঘরের দেওয়ালে একটা ছবি এঁকে দিবি পলাশদা?

পলাশ এক মনে ছবি আঁকছিল। অন্তরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, উচ্চমাধ্যমিকটা পাশ করেই এখান থেকে পালিয়ে যাস।

পলাশ অবাক হয়েছিল, কোথায় যাব?

তুই এত ভাল ছবি আঁকিস। শান্তিনিকেতনে যাস। ছবি আঁকা শিখবি। তোর দ্বারা লেখাপড়া হবে না। আর এখানে থাকলে তোকে বাঁচাতে পারব না।

উচ্চমাধ্যমিকটা মনে হয় পাশ করতে পারব না।

আমারও তাই ধারণা। তবু বলছি।

যদি ফেল করি?

ফেল করলে করবি। আরও একটা বছর তোর কপালে দুর্ভোগ। তার পর পালাবি। একই ব্যাপার। এত শুকোস কেন তুই?

কত সহজ করে ভাবতে পারিস তুই। তোকে যত দেখি অবাক হই।

নে আর অবাক হতে হবে না।

না রে বানিয়ে বলছি না। সত্যি।

চুপ কর, তোকে একটা জরুরী কথা বলার আছে।

বল না।

এখন বলা যাবে না। পরে বলব।

এখান বলা যাবে না কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা গান গেয়ে উঠেছিল অন্তরা। গান শেষ হতে বলেছিল, পলা দা, এক একটা কথা বলার এক একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। গানটা শুনলি তো? যে দিন এমন হবে সে দিন আসিস। বলবো।

পলাশের মনে পড়ে গেল, গানটায় ঠিক এমনই একটা দিনের কথা বলা ছিল। তাকে জরুরী কথা বলার জন্য অন্তরা নিশ্চয়ই বসে আছে। তার হঠাত মনে হল, কথাটা শোনা খুব দরকার। কথাটা না শুনে মরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। উঠে দাঁড়াল সে। তার পর অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শ্মশান থেকে বেরনোর রাস্তা খুঁজতে শুরু করল।

তিন...

অনেক দিন পর শ্মশানে মানুষ আসতে দেখে শ্মশানকোকিল দু'টি বড়ই অবাক হয়েছিল। বয়সে নবীনটি উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিল। সে তখনই ডাকতে গেছিল। তাকে নিবৃত্ত করেছিল প্রবীণটি। বলেছিল, কোনও কিছুতেই তাড়াহুড়ো করতে নেই। যে ঘটনা ঘটবেই তা নিয়ে আদেখলামো করা উচিৎ নয়। ছেলেটা তো মরবেই, কারণ সে নিজেই মরতে চায়। ওকে আর কিছুক্ষণ বাঁচতে দেওয়া উচিৎ। আমরা আর একটু পরে ডাকব।

তারা দু'জনে ছেলেটির গতিবিধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছিল। হঠাতই বৃষ্টি নেমে গেল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটু ঝিমিয়ে গেছিল প্রবীণ শ্মশানকোকিলটি। ছেলেটি উঠে দাঁড়াতেই নবীনটি নড়েচড়ে বসল। সে ডেকে তুলল তার বয়োজ্যেষ্ঠকে। তারা দেখল, অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে শ্মশান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ছেলেটি। কেমন যেন একটা একবগগা ভঙ্গি তার। শিকার ফস্কে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যস্ত হয়ে ডেকে উঠল তারা। সেই বুড়ো মানুষের কাশির শব্দের মতো ডাক।

আওয়াজটা কী ছেলেটির কানে পৌঁছায়নি? সে তো একটুও থমকাল না! চমকাল না! দিব্যি হেঁটে চলেছে। এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। শ্মশানের সীমানা পেরিয়ে গেলেই এই ডাকের কোনও শক্তি থাকবে না। শ্মশানকোকিল দু'টি গলার শিরা ফুলিয়ে ডাকতে শুরু করল। কিন্তু ছেলেটি নির্বিকার। শ্মশানকোকিলের অমোঘ মৃত্যুডাক তাকে স্পর্শটুকুও করছে না। করবে কি করে? ছেলেটার কানে তো সে ডাক ঢুকছেই না। তার সমস্ত চেতনা জুড়ে বেজে চলেছে একটা গান। তার রক্তপ্রবাহে মিশে যাচ্ছে সে গানের কথা আর সুর। সে গুনগুন করছে গানটা...

'ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়
বিজলি থেকে থেকে চমকায়
যে কথা এ জীবনে
রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়...
এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়
এমন দিনে মন খোলা যায়...'

এ ঘটনা শ্মশানকোকিলদের অভিজ্ঞতায় নেই। তারা জানে না মরতে আসা মানুষ কীসের টানে ফিরে যায় জীবনের দিকে! আর এক বার কেউ জীবনের দিকে ফিরলে তাকে মারা বড় কঠিন কাজ। নিজেদের ব্যর্থতায় বিরক্ত হয়ে শ্মশানকোকিল দু'টি গুম হয়ে বসে রইল।

SUNDARBANS
Fish Bazar

Meat & Grocery
Certified Zabiha Halal Meat

Frozen Fish, Halal Meat - Bangla Audio/Video
Bangladeshi Sweets
- Phone Cards & Much More

OPEN 7 DAYS 9 AM - 9 PM	6409 N. Bell, Chicago, IL 60645 **Tel: (773) 761-8780**	Omar Faruq

Delivery available !!

Reminiscences
Srinjoy Ganguly

Lending an ear to Birendra Krishna Bhadra's rendition of "Mahisasura Mardini" at the break of dawn on Mahalaya every year is indeed a transcendental experience.

Typically, the most defining feature of the experience entails one waking up earlier than usual to gather in a commune and hear the 90 minute composition that has managed to capture the Bengali community's unequivocal attention for more than 8 decades now. My experience differs though and I need to thank my unorthodox body clock for it. I prefer sleeping after having heard Mahalaya at the juxtaposition of the end of one day and the beginning of another. I can't describe in words the magic that I witness every time when the evanescent darkness gradually makes way for BK Bhadra's sonorous vocals; words which turn fluid to suffuse the milieu thereby enabling me to willingly surrender to its warm embrace.

The familiar has its distinctive charm.

I must make a confession here though – This ritual didn't seem terribly profound to me when I lived in Calcutta. It seemed more a preserve of mere symbolism than anything substantive. The last six years' exile has actually helped me discover a new meaning to it. Given that I plan my yearly calendar from one Durga Pujo to another (like any other quintessential Bong), Mahalaya for me is like a bugle call signifying homecoming. It is precisely the

“familiar”, which I earlier alluded to, that I want to seek when I visit Calcutta. The fact that many others single out this one window of time every year to engage in a similar exercise does definitely help. Pujo is after all as much about the unplanned as it is about the planned, right?

I’d like to use an example to explain what I mean.

As we all know, Maddox Square’s defining feature is that, on Ashtami evening, it is like a timeless melting pot for everything Calcutta is perhaps the biggest draw for someone who cherishes his roots. While I can take comfort in knowing that I can always count on my tribe to have my back in the present, running into an old face without notice has a charm of its own. While the extent of social intercourse thereafter can range all the way from bumbling bonhomie to merely a furtive glance, this interaction has a greater significance. You are endowed with a vista to revisit a shared past and look back with wonder, therein sparking a profound realization.

Rationalizing that the universe probably conspired to arrange different elements of my past at the same place and at the same time (instead of an infinite other permutations) does endow me with a sense of comfort. Prima facie my circumstances might have drastically changed; but I am probably just a stone’s throw away from where I originally started out. Knowing that I can go back whenever I want to helps make the future seem less domineering.

The familiar can indeed be very empowering at times.

Getting back to normal now

Vikram Konkimalla (9 years)

This year has been a year of getting back to normal for school children So what does this mean? This means back to school and back to a normal student life attending school, completing class assignments, attending extra-curricular in school activities and playing during recess. This makes school really exciting for me because we get to see old and new faces though all in masks which is the new norm. Sometimes it feels weird that I cannot recognize the faces of my friends. We also have to be completely engaged in class and not fall asleep! This is because the teacher can see everyone face to face. Alas! No more hiding from the camera or the video on google meet. We cannot escape anymore or be in our own dreamworld. Getting up early is another new routine that takes time getting used to after those long snuggles with parents and easy wake up during the COVID times. How much I miss the extra time under the blanket and the snuggles from my parents each day; this will always be a fond memory of my virtual learning experience last year.

Life is tough now with wearing masks all the time now in school. The new rules state that we cannot take it off to chat with friends or socialize with them. The only relief comes during lunch times when we can take off masks and have some quiet and soft conversations with friends without the reminders about masks. The usual sound of kids chatting away has now been replaced by low voices

and I can feel the change in scenario. It took some time for me to master using low voices as I am always very loud and love to chitter chatter. And further we are reminded about maintaining a distance between us! Sadly, hugging our friends in the morning and a quick high five are no more acceptable or allowed. So, how do we greet our friends now?? We elbow each other and that's the new norm of saying hello in school.

So, does this make school interesting? Yes of course! I am a proud member of our school musical band where I have joined as a saxophonist. Saxophone helps me to create music with my mouth. It is quite a heavy instrument but creates magical sound and so far, I have learnt to play it well; The lasting impact that it leaves on the listener is what motivates me. My school has been welcoming and has done a wonderful job in keeping us safe and yet allowing us to bond in different ways that allow us to maintain our friendships and create memories. I am loving school so far … it feels so normal now

While I am enjoying school there are a few things that I miss. I especially miss Posto and Dal for lunch now that I eat in school. I also miss the rich Rohu fish dish which my mom would feed me during lunch and oh! the spices would leave such a lingering taste in my mouth not to mention the delectable Rasgullah as a treat after lunch!

So, this year during Durga Pujas, I will pray to Ma Durga that with her grace we will have a mask free school life and freedom to do anything that we want to do in the

coming year. After all isn't it high time that we had our full faces shown – those lit up eyes and smiles that make us and others feel so welcomed.

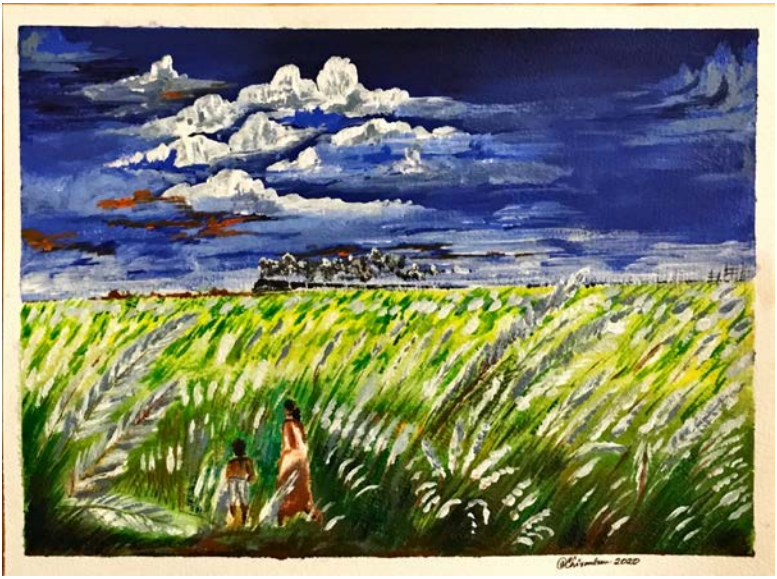

Chirantan Chakraborty

বাজার করোনা

এখন আর বাজারে গিয়ে দরদাম করে জিনিস কেনা হয় না। সব্জিওয়ালা মহা সেয়ানা। কাছে গেলেই মাস্কটা ভক্তিভরে গলার কাছে নামিয়ে গদগদ স্বরে নিপাট ভালোমানুষের মতো বলে, 'কী চাই বাবু?'। ব্যাস, ওখানেই বাজারের সমাপ্তি। ওর ওই মাস্ক-খোলা দেখে আপনি হৃদযন্ত্রে মৃদু কম্পন টের পান। আপনার হাত পা থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের আনাগোনা শুরু হয়। আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে কে যেন "গুরুদেব দয়া করো দীনজনে" (×2) গানটা ঘড়ঘড়ে গলায় গাইতে থাকে। আপনার দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। আপনি স্পষ্ট দেখতে পান, সব্জিবাজারের দূষিত বাতাসে ঝরা পালকের মতো কী যেন একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

করোনা!

বাতাসে করোনা, হাতে করোনা, গলায় করোনা, কব্জিতে করোনা, প্লাস্টিকে করোনা, চুমুতে করোনা, তারা ঝিকমিকি আকাশের নীচে করোনা, স্কুল ব্যাগে করোনা, বাইকের চাকায় করোনা ------- উফফ! বিশাল লম্বা ফিরিস্তি।

'ধুস! কী হবে মাস্ক পরে?'। মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, মাস্কে তো নয়! আপনার ভিতরকার সুপারম্যান শীতঘুম থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। আপনি তাচ্ছিল্যভরে নিজের মাস্কটা খুলে সযত্নে পকেটস্থ করেন। তারপর দাড়ি চুলকে রাশভরী গলায় সব্জিওয়ালার উদ্দেশ্যে বলেন,"বাটখারায় কারচুপি করিসনি তো?" হুঁ হুঁ বাবা! আমিও মহা ধড়িবাজ। চেনোনা আমায়!

আপনার দিব্যদৃষ্টির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। আসুন, 19 সেকেন্ডের জন্য নীরবতা পালন করি।

"নাই নাই ভয়

হবে হবেই জয়

খুলে যাবে এই মাস্ক"

10% Discount available for UIC students with ID

Life happened…Love did not!

“নন্দন”

“সখী ভালোবাসা কারে কয়?”
“যত্তসব ফিলোসফিকাল কচকচানি। সোজা জিনিস সোজা ভাবে বললেই হয়।”
“আহা! ওরম রাগ করে কী হবে? যাহা সত্য, তাহাই সুন্দর সখী। তাহাই ব্যাখাহীন। তাহাই “নন্দন”।”
“তোর EQ 0 নন্দন! Accept it!”
অভিমানে বেরিয়ে যায় দৃস্টি।
“Koi roko naaa… deewane ko… mann machal raha…” গুনগুন করে ওঠে নন্দন।

তখন নন্দনের ২১ বছর বোধহয়… থুড়ি ১৮। এই সব গল্পে মেয়েদেরই কেন ১৮ হয় কে জানে। নন্দুর চোখে তখন সারা জীবনের স্বপ্নানচিকেতা শুনে শুনে মনস্থির করে ফেলেছে যে প্রেম সে নীলান্জনাকেই করবে। কিন্তু মাঝে মধ্যে রূপমদা মা থায় এসে অনামিকার দিকেপাল্লা ভারি করে চলে যায়। খুবই অস্থির সে এই দোনা মনায়। কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ সাইকেল নিয়ে উল্টে পরে স্বপ্নের জগৎথেকে বাস্তবে নেমে আসে নন্দন।

খুউব লেগেছে! উঠে দেখে উল্টোদিকে আরেকজন পড়ে আছে। একটি মেয়ে, রক্ত বেরোচ্ছে হাত দিয়ে। কাছে যায় নন্দন।
“Sorry, আপনার লেগেছে?”
মেয়েটি চুপ। তার সাইকেলটি ওপর থেকে সরিয়ে পাশে রাখে নন্দন।
“ইসসস্, অনেকটা কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, I am really very sorry.”

মেয়েটির চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে। সেসব দেখে নন্দন নিজের ব্যাথা ভুলে গেছে।
“এই দেখুন প্লিজ কাঁদবেন না, আমার সত্যি খুব ভুল হয়ে গেছে, একদম খেয়াল করি নি। চলুন, একটা ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করি।”
“আপনার নাম?”
হ্যাঁ, ঠিকই ভাবছেন, এইখান থেকেই teenage প্রেম/ভালোবাসার শুরু নন্দ নের। না, নীলান্জনা বা অনামিকা কেওই নয় সে; নন্দিনী! দুজনেই নন্দু!

নামেই মিল খালি, আচার আচরণ, পারসোনালিটি একেবারে বিপরীত মেরু। কিন্তু এইরকম কাব্যিক প্রেমের জন্য নন্দন সব মানিয়ে নিতেরাজি। নন্দন স্পষ্ট বক্তা হ লেও প্রচন্ড philosophical। নন্দিনী introverted; কিন্তু নিজের মতাম ত দিতে ছাড়ে না।

জীবনে প্রথম প্রেমের একটা আলাদা নান্দনীকতা আছে। লোকে বলে “you can never forget your first love!”; কিন্তু “সখী ভালোবাসাকারে কয়?”
ভালোবাসার বিভিন্নরকমের সঙ্গা, যার যার নিজের মতো। সেটাই ম্যাজিক। পুরো ব্যাপারটাই ব্যক্তিগত।

নন্দিনী হাত ধরতে চায়; নন্দন কবিতা বলে এড়িয়ে যায়। নন্দন সিনেমা দেখতে যেতে চায়, আর নন্দিনী চায় ফোনে কথা বলতে।
নন্দিনী রেস্টুরেন্টে খেতে যেতে চায় আর নন্দনের “ভালো লাগে ঐ আকাশের তারা গুনতে”।

“নন্দন তুই এরম কেন?” রেগে গর্জে ওঠে নন্দু।
“আহা! রাগ করছিস কেন? মনে আছে তো? ফারদিনের ‘yeh haseen dard mujhe de do’ থেকে আমাদের এই পথ চলা শুরু!”

হেসে ওঠে নন্দু ১।

“সব ব্যপারে ইয়ারকি ফাজলামি পোষায় না, আর তার মধ্যে যত্তসব রাবিশ সিনেমার লাইন।”

“আচ্ছা Sorry! তোর চাইটা কী?”

“তুই ভালোবাসিস না আমায়!”

“এরম মনে হওয়ার কারণ?”

“I don’t feel special with you at all. তোর শেখা উচিৎ চয়নের থেকে!”

“আরে ঐ গাধাটা আবার আমায় কী শেখাবে?”

চয়ন আর নন্দন ছোটবেলার বন্ধু। সেই সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টের দিন, যেটা নয় নয় করে নয়মাস হয়ে গেল, এই চয়নই দুই নন্দুকে নিয়েগিয়েছিল পাশের একটা বাড়িতে, ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করতে।

“তুই ইচ্ছে করে না বোঝার ভান করিস?”

“না মানে এটা তো বুঝতেই পারিনি… কবে থেকে…”

“তুই বোঝার চেষ্টা করেছিস কখনো?”

“I am happy for you two…”

“Chhan se jo tute koi sapna, jag suna suna lage…” নিজের মনে গেয়ে ওঠে নন্দন। আজ মনটা ঠিক ভালো নেই- তথাকথিতসামাজিক প্রেমের মর্যাদা পায়নি। এটাই বোধহয় জীবন।

Life happened… love didn’t!

মাঝে বছর ৩-

৪ কেটে গেছে। নন্দনের প্রেমের স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর ভালোবাসার প্রতি রোম্যান্টিসিসম ওনেকটাই কমেছে কিন্তু মনে মনেস্থির করে রেখেছে এবারে প্রেমে

পড়লে কোনোরকমের গাফিলতি করবে না| আরো বেশী attentive হবে, আরো caring হবে… ইত্যাদিইত্যাদি।

আঁখি- কী সুন্দর নাম! নামের মতোই সুন্দর চোখ দুইখানি। 'Kal Ho Na Ho" বাংলায় লেখা হলে পাক্কা "mere naina, mere naina ko dhoondte
hai"র জায়গায় "আঁখি" লেখা হতো। আঁখির ক্লাসে ঢোকামাত্র নন্দন স্থিত হয়ে যায়। সুদূর USA তে higher
education এরজন্য এসেছে নন্দন, মাস খানেক হল। কখনো তো দেখে আঁখিকে… orientation এও না।

প্রফেসর নাম জিগ্যেস করায় এবং অতোসুন্দর নামের murder করার সৌজন্যে নন্দন আঁখির নাম জানতে পারে।মান্না দে গেয়েছিলেন-
"হৃদয়ে লেখো নাম, সে নাম রয়ে যাবে।" নন্দন মনে মনে তখন Dhoom-এর উদয় চোপড়া। কল্পনাতেই সংসার বানিয়ে ফেলেছে। এরজন্যই প্রথম প্রেম টেকে নি। টেকা উচিৎও ছিলনা। আঁখিই deserve করে নন্দনের সম্পুর্ণ ভালোবাসা। তার আগেপিছে সব মিথ্যে।

ক্লাসের শেষে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায় আঁখির দিকে। সে তাকাতেই একটু হকচকিয়ে গিয়ে নন্দন হাত বাড়িয়ে বলে- "Hi, I am
Nandan". উত্তর আসে- "myself, Aankhi."
"You know that's a Bengali name."
"Well, that's because I am a Bengali. You don't seem like one. Where are you from?"
নন্দু সবকা বন্দুর মতো নন্দন তখন মনে মনে লাফাচ্ছে। প্রেমের তো ভাষা নেই কিন্তু ঝগড়া-খুনসুটিটা যে বাংলায় করা যাবে এটা ভেবেইআনন্দে আত্মহারা সে।
"এমা…. না না আমি বাঙ্গালী!"

“ওহ্, তাই নাকি? আমি বর্ধমান।”
“আমি অযোধ্যা।”
“ওহো… প্রবাসী?”
“এই রে না না, পুরুলিয়ার টা।”

গতানুগতিক ভাবে বেশীরভাগ প্রেমের সম্পর্ক awkward বন্ধুত্ব দিয়ে শুরু হয় । নন্দন আর আঁখির perfect প্রেমও তার ব্যতিক্রম নয়।“Woh shaam kuchh ajeeb thi…”

নন্দন খুব ভালো গান গায আর আখি সুযোগ পেলেই তা শুনতে চায়। এখন অভি মান করে আঁখি যদি বলে ওঠে -
"তুই আমায় একদমভালবাসিস না", নন্দন উত্তরে গেয়ে ওঠে - "Humein tumse pyar kitna, yeh hum nahin jante..."

নন্দন খুব ভালো গান গায়, আঁখি সুযোগ পেলেই তাই শুনতে চায। এখন অভিমা ন করে আঁখি যদি বলে ওঠে- “তুই আমায় একদমভালোবাসিস না।”
নন্দন উত্তরে গেয়ে ওঠে- “Humein tumse pyar kitna, yeh hum nahin jante…”
আঁখি অনেকবার গান শিখতে চেয়েছে কিন্তু নন্দন মানা করে
দিয়েছে, কারণ সে formally
trained নয়, নিজের মনের খুশিতে গায়। অবশ্য ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত শে খানোর লোকের সন্ধান করেদিয়েছে। আঁখি সেরমই একজন মাস্টারমশাই এর কা ছে গান শেখা শুরু করেছে।

ওদের একটা অ্যাডভেঞ্চার গ্রুপ আছে: আঁখি, নন্দন, দৃষ্টি, কুনাল, হোসেন, রিও এবং শেরিন। এদের সবার মধ্যে আঁখিই সবচেয়ে কমঅ্যাডভেঞ্চারাস কিন্তু নন্দনে র পাল্লায় পড়ে ওর হাত ধরে ধরে সব জায়গায় পৌঁছে যায়। এখন আর নন্দন হাত

ছাড়িয়ে নেয় না, বরংভালোই লাগে তার। একসাথে ওঠাবসা, হোমওয়ার্ক করা, রুমমেট ও বন্ধুদের থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করা (স্পেশালি দৃষ্টি, সারাক্ষণ পেছনে লাগে বেচারাদের) বেশ পিকচার পারফেক্ট চলেছে বছর দুই।

গ্রাজুয়েশনের পর অনেক চেষ্টা করেও একই জায়গায় চাকরি পায়নি নন্দন আর আঁখি। নন্দন আগে চাকরি পেয়ে যাওয়ায় অন্য শহরেপাড়ি দেয়। আঁখি কে যথাস ম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা চালিয়ে যায় নন্দন কিন্তু যতদিন পেরোয় ততো কিছু এক টা missing অনুভব করতেথাকে। আখি ফোন ধরে না, ধরলে কথা বলে না ঠি ক করে। মেসেজের রিপ্লাই করে না। দৃষ্টি আর রিও কাছে থাকলেও তারা এখন আঁখিরকথা বললে এড়িয়ে যায়। নন্দন বুঝতে পারে যে এই সময়ে আঁখির কাছে থাকাটা খুব জরুরী, সে হয়তো depressed। না জানিয়েসারপ্রাইজ দেবে ব লে চলে যায় একদিন আঁখির কাছে।

আঁখি ছিলোনা ঘরে, ওর রুমমেট ঢুকতে দেয়। অনেকবার কল করলেও ফোন ধ রে না আঁখি। বোধহয় গানের ক্লাসে গেছে, ওটাই একমাত্রমনের খুশিতে করে এখ ন। ওর রুমে এদিক-
ওদিক করতে করতে নন্দনের চোখ পড়ে ওরই উপহার দেওয়া একটি ডাইরির দি কে। মুচকিহেসে ওঠে। অনেক মিস করেছে আর সম্ভব নয়। আঁখি এলেই ওকে ব লবে ওর সাথে যেতে এবং ওখানে গিয়ে জব সার্চ করতে। ডাইরিরপাতা উল্টে পা ল্টে দেখে নন্দন।
একটি পাতায় লেখা:

“I am not sure how to leave him because of two reasons: for whatever he has done for me and for there is no one who could love me like he does.”

তাড়াতাড়ি পাতা ওলটায় নন্দন।

“But I don’t love him. How do I tell him about Sai Sir? I want to be with him only. We have a divine musical connection.”

হাত থেকে পড়ে যায় ডাইরিটা। "Sai Sir"

- উনার কাছেই তো আঁখি গান শিখতে যায়।

আঁখি ঘরে ঢুকেই নন্দনকে দেখে ঘাবড়ে যায়। নিচে খোলা ডাইরি আর নন্দনের লাইফলেস মুখ দেখে চেঁচিয়ে ওঠে - "How dare you?"

নন্দন চেয়ে দেখে আঁখির দিকে। আজ তো ওর চোখ দুটো অত সুন্দর দেখাচ্ছে না।

"কারো পার্সোনাল ডাইরি পড়তে নেই জানিস না? না বলে ঘরে ঢুকে বসে আছিস! লজ্জা করে না?"

নন্দন জানেনা কিভাবে রিঅ্যাক্ট করবে। এসবের জন্য সে একেবারেই অপ্রস্তুত। সারপ্রাইজ দিতে এসে এরকম shocked হবে কখনোইকল্পনা করেনি সে।

কোন রকমে জিজ্ঞেস করল - " কিন্তু কেন? একবার বলতে পারতিস।"

"বেরিয়ে যা!"

“Bina tere na ek pal ho, na bin tere kabhi kal ho
Yeh dil ban jaye patthar ka, na ismein koi hulchul ho…”

“বড্ড বাজে গান করিস, now please leave!”

আঁখি এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে মাটিতে নন্দন। পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে রিও কে কল করে। রিও এসেদৃষ্টির বাড়ি নিয়ে যায় সেখানে গিয়ে আরো কিছু অপ্রিয় ঘটনা জানতে পারে। নন্দন বুঝতে পারে বন্ধুরা তাকে বেশ কিছুদিন ধরেইheartbreak হওয়া থেকে আগলে রেখেছিল।

“Selfish! Cheater!” - রিও বলে ওঠে।

"ওসব ভেবে লাভ নেই নন্দন, you deserve better! আমায় দেখ, আমি কিন্তু তোর জন্য সব সময় single and available!" - সিচুয়েসনটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে দৃষ্টি।

"জাস্ট জানাতে পারতো একবার। সর্বস্ব দিয়েও কি করে এরকম ছড়িয়ে ফেলি কে জানে?" - হতাশ হয় নন্দন।

"তোর মধ্যে emotions কম নন্দন, feelings বিশুদ্ধ কিন্তু সে তো তোর নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। Emotions দেখাতে হবে তো!"

“বুকের ভেতর নোনা ব্যথা
চোখে আমার ঝরে কথা
এপার ওপার তোলপার একা
…
যাও পাখি বলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে
সুখে থেক, ভালো থেক
মনে রেখ এ আমারে”

এয়ারপোর্ট থেকে আঁখি কে একটা শেষ ম্যাসেজ করে নন্দন.

“I'm Sorry....”
“For What?”
“For loving you too much,
For missing you....
I'm sorry for wanting to see you everyday,
For always thinking about you before going to sleep....
For feeling upset if I don't see you....
For wanting to be on your side....

I'm sorry for wanting to make you HAPPY....
For wanting you to be part of my life....
For trying to make you smile....
For dreaming about you everyday....
I'm sorry for replying back as quick as possible....
I'm sorry for getting mad, sad and jealous....
I'm sorry for being just a simple game....
I'm sorry for thinking that you loved me....
For annoying you with my calls and messages....
I'm sorry for caring about you....
I'm just....
Sorry for every single mistake I made."

তার যে গানের জন্য পাগল ছিল আঁখি সেটাই শেষ বারের মতো voice message রেকর্ড করে পাঠায়। হয়তো একটা শেষ চেস্টা।

"আমি পারিনি তোমাকে
আপন করে রাখতে,
আমি পারিনি তোমাকে
আবার আমার করে রাখতে।

তুমি বোঝনি, আমি বলিনি
তুমি স্বপ্নতে কেন আসনি?
আমার অভিমান তোমাকে নিয়ে
সব গেয়েছি।"

Block করে দেয় আঁখি।

Life happened yet again, but love didn't.

মাঝে বেশ কয়েক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। নন্দনের রিও আর দৃষ্টি বাদে কারো সা থে সেরম যোগাযোগ নেই। তারা তিনজনই এখনো অটুটআঁখি আর নন্দিনী দুজ নেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সেই খবর পেয়েছে নন্দন। না সাই স্যার বা চয়ন দুজ নের কারোরই তাদের বর হওয়ারসুযোগ হয়নি।
রিও তো বাবা হয়ে গিয়েছে, আর দৃষ্টি এখনো নন্দনের জন্য single and available. সকলেই নিজের লাইফে ব্যস্ত, life happened to everyone.
ভালোবাসায় লেঙ্গি খেয়ে কিছু শেখা কেই বোধ হয় লাইফ বলে। খালি যে ভালো বাসা সংক্রান্ত জিনিসই শেখা যায় তাতে তা মোটেই নয়, বরং মানুষ অনেক প্র্যা কটিক্যাল হয়ে ওঠে এবং ফিলোসফিক্যাল জ্ঞান দিতে ওস্তাদ হয়।

নন্দনের ভালোবাসার সংজ্ঞা এখন অন্যই রূপ নিয়েছে। দৃষ্টি মাঝেমধ্যে অনেকবার ই প্রেম নিবেদন করেছে নন্দন কে। খুবই ভালবাসেওকে, সময়ের সাথে আরো ভালবেসে ফেলেছে। রিও ও অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু নন্দন এ কেবারে "sakht launda" যাকেবলে।
দৃষ্টি এর প্রচুর খেয়াল রাখে নন্দন, হয়তো ভালই বাসে কিন্তু ওই যে সংজ্ঞা বদ লে গিয়েছে জীবনের সাথে।
সবার মতে নন্দনের ইমোশনস্ নেই, তাহলে এই care বা ভালোবাসা বোঝাবে ই বা কি করে? Feelings are personal. কিন্তু সত্তিকারেরভালোবাসার মানুষকে জানানো কি প্রয়োজনীয় ন য়?
নন্দনের adult life এর অনেক সুখ-
দুঃখের সাথি দৃষ্টি, প্রাণের বন্ধুকে কি প্রেমিকা বানানো যায়? “Pyaar dosti hai.” ওর যা ট্র্যাক রেকর্ড - ভালোবেসে যদি হারিয়ে ফেলে দৃষ্টি কেও? এটা কি life

happens এর দোহাই দিয়ে love কে আটকে রাখা নয়? নাকি চিরাচরিত ভাবে এটাইজীবন এগিয়ে যাওয়ার পরম সত্য?

"তুই কি একটুও ভালোবাসিস না আমায়?"
"আহা! এসব প্রেম, love, ভালোবাসা বেকার জিনিস এসব করে কি হবে?"
"বাজে কথা বলবি না একদম।"
"সখী, ভালোবাসা মানে শুধু অভিনয়..."
"আমি জানি তুই ভালোবাসিস, একবার 'I Love You' বলতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়?"
“কবিগুরু নচিকেতার প্রেম গেম তো বয়ান হয় ‘আঁখি’ দিয়ে...”
দৃষ্টি হতাশায় পিছু ফিরতেই ওর হাত টা ধরে নন্দন নিজের সহজাত স্বভাবে গাই তে শুরু করে-
“আমি চাঁদের আলো হয়ে
তোমার কালো ঘরে
জেগে রই সারা নিশি
এতটা ভালোবাসি
এতটা ভালোবাসি
...
আমি সূর্যের আলো হয়ে
তোমার চলার পথে
ছায়া হয়ে তোমায় দেখি
এতটা ভালোবাসি
এতটা ভালোবাসি”

Life happens, কিন্তু love did not happen হয়েও কি দৃষ্টি-নন্দন?!

SUPERKHANA INTERNATIONAL

https://www.superkhanachicago.com/

শিব ঠাকুরের আপন দেশে

Somsubhra Ghosh

পরিযায়ী

১৪২৮

Rukmava Chatterjee

Surguru

Masala's

Mini Mart

"Add little masalas to your life"

2229 W Taylor St, Chicago, IL 60612
10am- 9pm (all 7 days)
(312)-929-4073

- *Free delivery for orders above $30*
- *$4 (Student Special Saturday Sale)*
- *Special giveaways every month*

Stationery Essentials

Confectionaries

Daily Essentials

Festive Delights

Ready to Eat

Dairy, Fresh Produce & Kitchen Essentials